সর্বহারা মনিরা

রোমেনা আফাজ

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

সর্দার, একি হল আপনার? সারা দিনরাত ধ্যানগ্রস্তের মত এমনি করে বসে বসেই কাটাবেন? এখন রাত দ্বিপ্রহর। চলুন, শোবেন চলুন। রহমান বিনীত কণ্ঠে দস্যু বনহুরকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলল।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল— রহমান, এই গভীর রাতে গহন বনে করুণ সুরে কে কাঁদে?

সর্দার, আপনি ফিরে আসার পর কারও সঙ্গে কোন কথা বলেননি, কারও কথা জিজ্ঞাসাও করেননি। আপনার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর নূরী পাগল হয়ে গেছে।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করে উঠল— নূরী পাগল হয়ে গেছে! কই, একথা তো তুমি আমাকে বলনি!

আপনি তো কিছুই জানতে চাননি?

নূরী আমার মৃত্যু সংবাদে পাগল হয়ে গেছে! আর তাকে তোমরা এভাবে ছেড়ে দিয়ে রেখেছ।

সর্দার, তাকে আমরা অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারিনি। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন সে এমনি করে বনে বনে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ায়। সর্দার আশ্চর্য কোন হিংস্র জন্তু তাকে আজও খায়নি। কত বর্ষার পানি, কত রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহর কেটে গেছে তার মাথার ওপর দিয়ে, তবু সে ফিরে আসেনি!

বলো কি রহমান !

হ্যাঁ সর্দার।

উঠে দাঁড়াল বনহুর— চলো, ওকে ফিরিয়ে আনি রহমান।

চলুন সর্দার।

বনহুর আর রহমান আস্তানা ছেড়ে বনে প্রবেশ করল রহমানের হাতে জ্বলন্ত মশালের উজ্জ্বল আলোতে চারদিকে লক্ষ্য রেখে এগুতে লাগল ওরা দু'জন।

কিছু পূর্বে দস্যু বনহুরের কানে করুন একটা কান্নার সুর ভেসে এসেছিল। কোনদিক থেকে শব্দটা এসেছিল ঠিক বুঝতে পারেনি বনহুর, তাই এদিক সেদিক খুঁজতে লাগল রহমান আর সে।

গোটা বনে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও নূরীর সন্ধান না পেয়ে বিমর্ষ মনে এগুলো বনহুর ও রহমান। হঠাৎ মশালের আলোতে ঝর্ণার দিকে দৃষ্টি চলে যায় ওদের।

থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল রহমান— সরদার, ঐ যে নূরী!

বনহুর কোন কথা না বলে স্থিরচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। অদ্ভুত এ দৃশ্য! ঝর্ণার দিকে মুখ করে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত বসে আছে নূরী।

বনহুর পা বাড়াল নূরীর দিকে।

রহমান মশাল হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর ততক্ষণে নূরীর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটা পাথরখণ্ডে বসেছিল নূরী, বনহুর ওর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখল।

ধীরে ধীরে ফিরে তাকাল নূরী।

রহমানের হাতের মশালের আলোতে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল বনহুর— নূরীর একি চেহারা হয়েছে! রুক্ষ এলায়িত চুল, কোটরাগত চোখ, শুষ্ক গণ্ডদ্বয়। বনহুর আর নূরী কিছুক্ষণ উভয়ে তাকিয়ে রইল উভয়ের দিকে। বনহুরের চোখে মুখে রাজ্যের ব্যাকুলতা আর নূরীর দৃষ্টি উদাস, ভাষাহীন।

নূরীর এই চেহারা বনহুরের মনে দারুণ আঘাত করল, কিছুক্ষণ কোন কথা তার মুখ দিয়ে বের হল না। চোখ দুটো শুধু অশ্রু ছলছল হয়ে উঠলো। এবার বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল—নূরী!

নূরী নিশ্চল স্তব্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিল, সে বনহুরকে চিনতেই পারেনি। রহমানের মশালের আলোতে তাকিয়ে দেখছিল, বনহুরের ডাকে চমক ভাঙে, ঠোঁট দু'খানা কেঁপে ওঠে একটু— বলতে পারে না কিছু।

বনহুর পুনরায় বলে উঠল—নূরী আমায় তুমি চিনতে পারছনা?

এতক্ষণে নূরী কথা বলে— কে তুমি?

নূরীর কণ্ঠ স্বরে খুশি হয় বনহুর, বলে— আমি তোমার হুর!

তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল নূরী—না, না, না, সে বেঁচে নেই, সে বেঁচে নেই। বেঁচে নেই -- দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল নূরী।

রহমান বলল— সর্দার, চলে আসুন। আজ হঠাৎ ও আপনাকে চিনতে পারবে না। আসুন সর্দার।

বনহুর কিছুক্ষণ নূরীর দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরে দাঁড়াল— চলো রহমান।

আস্তানায় ফিরে এসে বনহুর অন্তরে অসহ্য ব্যথা অনুভব করতে লাগল কিছুতেই সে স্বস্তি পেল না।

গোটা রাত পায়চারী করেই কাটিয়ে দিল বনহুর।

ভোরের আলোতে পৃথিবী ঝলমল করে উঠল। গাছে গাছে পাখির কলরবে মুখর হল। সোনালী সূর্যের আলো এসে পৌছল বনহুরের আস্তানার গোপন কক্ষের চোরা শার্সি দিয়ে।

বনহুর কলিংবেলে হাত রাখতেই দু'জন অনুচর কক্ষে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানাল।

বনহুর বলল— রহমানকে ডাক।

বেরিয়ে গেল অনুচরদ্বয়। একটু পরে কক্ষে প্রবেশ করল রহমান, কুর্ণিশ জানিয়ে নতমস্তকে দাঁড়াল—সর্দার!

বনহুর রহমানের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

রহমান বনহুরের চোখের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরতেই চমকে উঠল, আশ্চর্য হয়ে বলল—সর্দার, সারারাত আপনি ঘুমান নি? চোখ দুটো যে আপনার জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে!

বনহুর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন চিন্তা করল, তারপর বলল— রহমান, নূরীকে আস্তানায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর।

রহমান বলে উঠল—সর্দার, অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।

যাও আবার চেষ্টা কর।

বেশ যাচ্ছি। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল রহমান।

প্রহর কয়েক পর ফিরে এলো রহমান, মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন। শরীরে কয়েক স্থানে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে।

বনহুর বলল— একি! নূরী এলো না।

না, সর্দার। এই দেখুন— আমি ওকে জোর করে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে ও আমাকে ঢিল মেরে আর কামড়ে এই অবস্থা করে দিয়েছে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্থিরচোখে রহমানের দিকে তাকিয়ে বলল— আচ্ছা যাও, আমি নিজে ওকে ফিরিয়ে আনছি। বনহুর কথা শেষ করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘন বনের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল বনহুর। মনে তার নানা চিন্তা। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া যেন তার জীবনটাকে একেবারে ওলট পালট করে দিয়ে গেছে। কি যেন ছিল, কি যেন নেই, কি যেন হারিয়ে গেছে। অভিশপ্ত জীবন বনহুরের, তাই তার জীবনে এত দুর্যোগের ঘনঘটা।

কিছুদূর এগুতেই দেখতে পেল অদূরে একটা গাছের তলে বসে কি যেন ভাবছে নূরী। হাতে তার এলোমেলো গাঁথা একটি ফুলের মালা। আর সম্মুখে পড়ে রয়েছে কয়েকটা পাথরের ঢিল।

বনহুর বুঝতে পারল, আবার যদি নূরীকে কেউ বিরক্ত করে তাই সে আগে থেকেই প্রস্তুত রয়েছে।

বনহুর কোন রকম শব্দ না করে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

নূরী ধ্যানগ্রস্তের মত বসেছিল, সম্ভবতঃ ফুলের মালাটাই বসে বসে গাঁথছিল সে, অর্ধেকটা গাঁথার পর কি বুঝি ভেবে কিছু ফুল ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলেছে আশে পাশে।

বনহুর একটা বড় ধরনের ফুল হাতে তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল নূরীর সম্মুখে— নাও।

নূরী চোখ তুলে তাকালো, কিছুক্ষণ স্থির নয়নে চেয়ে থেকে হঠাৎ একটা ঢিল তুলে ছুড়ে মারলো বনহুরের মাথা লক্ষ্য করে।

বনহুর একটুও সরলো না বা নড়লো না। ঢিলটা বনহুরের মাথায় লেগে কিছুটা কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

বনহুর স্থিরভাবে তবু দাঁড়িয়ে আছে। ফুলটা তখনও বনহুরের হাতের ফাঁকে।

নূরী আর একটা ঢিল তুলে পুনরায় যেমনি বনহুরের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়তে যাবে অমনি বনহুর প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল নূরীর গালে। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত থেকে ঢিলটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে দিল দূরে।

নূরীকে এভাবে আঘাত করে বনহুর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, ওকে টেনে নিল কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ডাকল ---- নূরী --- নূরী------বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো বনহুরের কণ্ঠ।

বনহুরের প্রচণ্ড চড়ে নূরী হতভম্বের মত চেয়ে রইলো ওর দিকে। উঃ বা আঃ কিছুই বলল না কিংবা কান্নায় ভেঙে পড়ল না।

বনহুর ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

নূরী এতক্ষণও হাতের মালাটা মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছিল। বনহুর ওর সম্মুখে বসে গলাটা বাড়িয়ে দিল— দাও।

নূরী স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে, মালাটা দেবে কিনা ভাবছে— কিংবা ভাবছে যে তাকে এমনভাবে আঘাত করতে পারে তাকে আবার মালা দেবে। হঠাৎ নূরী মালাটা পরিয়ে দিল বনহুরের গলায়।

বনহুর ওকে নিবিড় করে টেনে নিল কাছে, ডাকল—নূরী!

নূরী কিন্তু অবাক হয়ে বারবার তাকাচ্ছে বনহুরের মুখের দিকে। হয়তো স্মরণ করতে চেষ্টা করছে কখনও কোথাও একে দেখেছে কিনা। বনহুরের ললাটে গড়িয়ে পড়া রক্তের দিকে তাকিয়ে নূরী হঠাৎ নিজের চোখ দুটো হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল, তারপর আংগুলের ফাঁক দিয়ে বনহুরের কপালের রক্ত লক্ষ্য করে শব্দ করল—ইস।

বনহুর বুঝতে পারলো নূরীর একটু একটু জ্ঞান হচ্ছে। আশায় আনন্দে বনহুরের নিরাশ হৃদয় ভরে উঠলো। নূরীর মঙ্গল চিন্তাই এখন তার একমাত্র কামনা। যা ছিল সব হারিয়ে ফেলেছে সে। সিন্ধী নদীতে তার জীবন সঙ্গিনী মনিরাকে বিসর্জন দিয়েছে। বনহুর এখন সর্বদা মনিরার স্মৃতি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। যতক্ষণ মনিরাকে ভুলে থাকে ততক্ষণ তার মনে কিছুটা শান্তি থাকে। ওর কথা স্মরণ হতেই বিষিয়ে ওঠে অন্তরটা— অসহ্য ব্যথার কাঁটা খোচা দিয়ে চলে তখন ওর হৃদয়ে। তার মনিরা ব্যাভিচারিণী-----অসতী----যখনই এই চিন্তা বনহুরকে অস্থির বিচলিত করে তোলে তখনই সে নিজের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। ভুলে থাকতে চায় পুরোন স্মৃতি।

একদিন অবিরত ভেবেছে বনহুর, শুধু একমাত্র মনিরার কথাই সে ভেবেছে সর্বক্ষণ। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পায়নি—একটা অসহ্য যন্ত্রণা তার সমস্ত অন্তরকে দগ্ধীভূত করে দিয়েছে, তাই বনহুর আজ অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকতে চায়— নিজকে ভুলিয়ে রাখতে চায়, এমন সময় নূরীর পুনঃ আবির্ভাব বনহুরের জীবনে আনে অভাবনীয় একটা পরিবর্তন। দস্যু বনহুর একটা নতুন আলোর সন্ধান লাভ করে তার জীবনে। সত্যি নূরী

তাকে কত---- ভালবাসে বনহুর নূরীর মুখখানা তুলে ধরে বলে— নূরী, আমি মরিনি; আমি মরিনি। চেয়ে দেখ আমি তোমার হুর।

নূরী এবার গভীর মনোযোগ সহকারে তাকাল— কতক্ষণ কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হল না। হঠাৎ এবার বলে উঠল— তুমি বেঁচে আছ?

হ্যাঁ— হ্যাঁ নূরী আমি— আমি তোমার— বল—বল তুমি কে? বল -বল---

নূরী হাঁপাতে শুরু করলো—কিছু বলতে চাইল কিন্তু বলতে পারছে না।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল, বলল—দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখো, বল--- বল--- একবার নাম ধরে ডাকো নূরী।

এবার নূরী অস্ফুট শব্দ করে উঠল—হুর!

নূরী! আবেগভরে বনহুর টেনে নিল নূরীকে!

এতক্ষণ নূরী চিনতে পেরেছে বনহুরকে। নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলল তুমি বেঁচে আছ! তুমি মরে যাওনি?

না, না নূরী আমি মরে যাইনি।

কিন্তু ওরা যে বলেছিল---

ওরা জানতো না।

বড় শয়তান ওরা। দেখ হুর আমাকে ওরা—

হ্যাঁ—নূরী ওদের আমি ভীষণ শাস্তি দেব। চল ঘরে চল নূরী—বনহুর নূরীর হাত ধরে নিয়ে চলল।

নূরী ব্যথাকরুণ সুরে বলল— আবার তো চলে যাবে না?

না নূরী, আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

বনহুরের হাত ধরে নূরী আস্তানায় প্রবেশ করল।

❑

হতবাক স্তম্ভিত মনিরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে ভূলুণ্ঠিত শয়তান মুরাদের রক্তমাখা দেহখানা। কোলে শিশুপুত্র নূর। তখনও মনিরার

দৃষ্টি ওদিকের মুক্ত জানালার দিকে, যে পথে একটু পূর্বে তার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণাধিক স্বামী দস্যু বনহুর অন্তর্ধান হয়েছে।

মুরাদের আর্তচিৎকারে কক্ষটি তখন লোকজনে ভরে উঠেছে। সকলের চোখে মুখেই আতঙ্কের ছাপ। কেউ কেউ চিৎকার করে বলছে খুন, খুন, খুন—

অল্পক্ষণেই পুলিশ এসে হাজির হল সেখানে।

হোটেলের সবাই জানত মনিরা মুরাদের স্ত্রী। ঐ রকমই পরিচয় দিয়েছিল মুরাদ হোটেলের মালিকের কাছে এবং আসল নাম পালটে নিজের নাম শাহ হোসেন এবং মনিরার নাম মর্জিনা হোসেন রেখেছিল।

এক্ষণে শাহ হোসেনের মৃত্যুতে হোটেলের মালিক ভয়ে মুষড়ে পড়ল। তার হোটেলে খুন!—এটা হোটেলের বিরাট একটা বদনাম।

হোটেলের মালিক কম্পিত কণ্ঠে বলল— মিসেস হোসেন, কে আপনার স্বামীকে হত্যা করেছে বলতে পারেন? কে এসেছিল এখানে?

কিন্তু কি আশ্চর্য, শাহ হোসেনের স্ত্রীর চোখে এতটুকু পানি নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে—ব্যাপার কি, হোটেলের সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

পুলিশ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করে চলল— আপনার স্বামী কিভাবে নিহত হলেন আমরা জানতে চাই। কে তাঁকে হত্যা করল আপনি নিশ্চয়ই তা জানেন? আপনি যদি আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে চান তবে আমাদের নিকটে কোন কথাই গোপন করবেন না।

এত কথার পরও মনিরা নীরব! একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না। কিন্তু এভাবে নিশ্চুপ থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, পুলিশ তাকে অন্যভাবে সন্দেহ করতে পারে। তাই বলল মনিরা— কে ওকে হত্যা করেছে আমি জানি না।

পুলিশ ইন্সপেক্টার রাগত কণ্ঠে বলেন— আপনার সামনে আপনার স্বামীকে হত্যা করা হল অথচ আপনি জানেন না? এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

মনিরা আবার বলল— ওকে যে হত্যা করেছে তাকে আমি দেখেছি কিন্তু চিনি না।

সেদিন এর বেশি কিছু প্রশ্ন না করে লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ ইন্সপেক্টার বিদায় গ্রহণ করলেন।

হোটেলের মালিক নিজে মনিরার দায়িত্বভার গ্রহণ করল।

পরদিন পুনরায় পুলিশ এলো, মনিরাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন—আচ্ছা লোকটাকে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন মিসেস হোসেন?

মনিরা বললো— দেখেছি।

ওর চেহারা কেমন ছিল?

মুখে চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ী, গালপাট্টা বাঁধা, চোখে হিংস্র চাউনি--

এর পূর্বে আপনি কোনদিন তাকে দেখেছিলেন?

না।

আরও কিছুক্ষণ পুলিশ ইন্সপেক্টার মনিরাকে জেরা করার পর বিদায় গ্রহণ করলেন।

মনিরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মস্ত একটা বিপদ থেকে যেন সে উদ্ধার পেল। মনিরা অত্যন্ত সাবধানে পুলিশ ইন্সপেক্টারের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিল, কাজেই তার কথাবার্তা বা আচরণে তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে পারেননি পুলিশ ইন্সপেক্টার।

মুরাদের হাত থেকে রক্ষা পেল মনিরা। রক্ষা পেল পুলিশের হাত থেকে। সবচেয়ে বড় শান্তি তার স্বামী বেঁচে আছে। অনাবিল একটা আনন্দস্রোত মনিরার মনকে আপ্লুত করে দিয়েছে। যদিও তার স্বামীর মনে মুরাদের কথাগুলো অবিশ্বাসের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তবু এতটুকু দমে যায়নি সে। একদিন না একদিন এ ভুল তার স্বামীর ভেঙ্গে যাবে, একদিন ফিরে আসবে সে তার পাশে। আবার বলিষ্ঠ বাহু দুটি দিয়ে আলিঙ্গন করবে--- ঐ দিনটির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণবে মনিরা। অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করবে সে।

কয়েক দিন পর পুলিশের অনুমতি নিয়ে মনিরা হোটেল থেকে বিদায় গ্রহণ করল। কিন্তু এখন সে যাবে কোথায়? ঝিন্দ শহর তার কাছে নতুন। যদিও এ শহরে তার বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে, তবু দিনগুলো মনিরার স্বাভাবিকভাবে কাটেনি। কিছুদিন কেটেছে বনহুরের কেনা বাড়িতে, কিছুদিন মুরাদের বন্দীশালায় কিছুদিন কেটেছে বিভিন্ন স্থানে। মনিরা শহরের কোন জায়গা বা লোকজন কাউকেই চেনে না বা পরিচয় নেই।

এক রাতে নূরকে বুকে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসল মনিরা। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল—কাঁহা জায়েঙ্গী মাইজী?

মনিরা চট করে কিছু বলতে পারলো না, একটু চিন্তা করে নিল। যা হোক এখন তার স্বামীর দেয়া সেই বাড়িখানাতেই ফিরে যাওয়া উচিত। সেখানে তাদের অনেক অনুচর আছে, দাসদাসী আছে, নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা হবে না তার। মনিরা তাদের বাড়ির ঠিকানা বলল।

কিন্তু বাড়িতে পৌছে অবাক হল মনিরা— অপরিচিত এক পরিবার বাড়িটাতে বাস করছে।

মনিরা এবার কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে পায় না। বাড়ির মালিক জানিয়ে দিলেন বাড়িখানা তাঁরা কিনে নিয়েছেন, যারা তাঁর নিকট বাড়ি বিক্রি করেছে তারা চলে গেছে এদেশ ছেড়ে।

মনিরার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। চোখে অন্ধকার দেখছে, এখন সে কোথায় যাবে। ঝিন্দ শহরে তার আপন জন কেউ নেই, কাউকেই সে চেনে না, জানে না।

মনিরা নূরকে বুকে চেপে ধরে পথের বুকে নেমে দাঁড়ালো। দিশেহারা পথিকের মত পথ বেয়ে এগিয়ে চলল সম্মুখ দিকে।

মনিরার অপূর্ব রূপরাশি পথিকদের মনে প্রশ্ন জাগাল। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কে এই মেয়েটি কোথায়ই বা চলেছে। কেউ বা শিস দিল, কেউ বা বিদ্রূপ করল। মনিরা কোনদিকে না তাকিয়ে আপন মনে এগিয়ে চলেছে।

এমনি করে কতক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়াবে সে? সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়, তার পূর্বেই একটা কোন নিরাপদ স্থানে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। তাছাড়া কচি নূর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বিশ্রামের প্রয়োজন এখন তার।

মনিরা সামনে একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। মস্ত বড় গেট গেটের ওপাশেই গাড়ি- বারান্দা।

মনিরা গেটের নিকটে পৌঁছতেই একটা লোক বলল— কি চাও?

মনিরা বলল— রাতের মত থাকার একটু জায়গা চাই। লোকটা একটু ভেবে বলল— আচ্ছা, দাঁড়াও ভেতরে জিজ্ঞাস করে আসি।

একটু পরে ফিরে এলো লোকটা বলল— এসো।

মনিরার পা দু'খানা হঠাৎ কেঁপে উঠল, অজানা একটা আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে উঠল। না জানি এ কার বাড়ি। বাড়ির মালিক কেমন মানুষ কে জানে। কিন্তু এত ভেবে কি হবে, রাতে পথের বুকে রাত

কাটানো তার সম্ভব নয়! আশ্রয় তার চাই, কাজেই ভয় পেলে তো চলবে না। মনিরা লোকটাকে অনুসরণ করল।

কয়েকখানা কক্ষ পেরিয়ে একটা কক্ষে এসে প্রবেশ করল লোকটা কাল কাপড়ের পর্দা উচু করে ধরে বলল— যাও!

মনিরা নূরকে কোলে করে কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষে প্রবেশ করেই ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠল। একটা চৌকির ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে এক প্রৌঢ় মেয়েলোক। বিরাট বপু। মাথায় একরাশ চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মোটা পুরু দুখানা ঠোট। ঠোটের ফাঁকে তামাকের নল গোজা রয়েছে। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটা, দপ দপ করে জ্বলছে। মেয়েমানুষ নয়, যেন পুরুষের বাবা।

মনিরা ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল মহিলাটির দিকে।

মনিরাকে দেখতে পেয়ে মেয়েলোকটা তার বিপুল বপুখানা নাড়াচাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল। বাঁ হাতে নলটা একপাশে সরিয়ে বলল— তুমিই রাতের জন্য আশ্রয় চাও?

মনিরা ঢোক গিলে বলল— হ্যাঁ।

গম্ভীর ভারী গলায় বলল মহিলাটি— তোমার কোলে কি ওটা?

নূর তখন মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মনিরা বলল— আমার ছেলে!

হিংস্র একটা হাসির আভাস ফুটে উঠল— ভীমকার মহিলার ঠোটের ফাঁকে।

মনিরা শিউরে উঠল। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তার বুকটা। নিজের জন্য মনিরা এতটা ভীত নয়, কেমন যেন ভয় হল তার নূরের জন্য। মনিরা বুকে আঁকড়ে ধরল কচি নূরকে।

মহিলা মেঘের মত গর্জন করে উঠল— বেশ, ওকে নিয়ে যা, পাশের ঘরে ওর থাকার জায়গা করে দে।

মনিরার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এখানে কেন এসেছিল সে! এমন আশ্রয়ের চেয়ে ফুটপাতের আশ্রয় তার অনেক ভাল ছিল। এমন ভয় হচ্ছে কেন তা বুঝতে পারে না মনিরা। পালাবার জন্য মন তার অস্থির হয়ে উঠল।

লোকটা এবার মনিরাকে সঙ্গে করে একটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজায় তালা লাগান।

মনিরার সামনে যেন আর একটা নতুন বিপদের ঘন ছায়া নেমে আসছে। কে যেন অদৃশ্য হাতে গলাটা টিপে ধরছে তার।

লোকটা ততক্ষণে দরজা খুলে ধরেছে— যাও, এ ঘরে রাত কাটাও।

মনিরা নিরুপায়ের মত নূরকে কোলে করে কক্ষের দরজার পা রাখল। কক্ষে প্রবেশ করে দেখল খুব বড় নয় কক্ষটা। কক্ষের মেঝেতে গালিচা পাতা। একপাশে কয়েকটা বালিশ বিক্ষিপ্ত ছড়ান রয়েছে। মনিরার দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেল এক পাশে—একি! চমকে উঠল সে। গালিচার এক ধারে একটা রেকাবির উপর কয়েকটা কাঁচের গ্লাস আর খালি কয়েকটা বোতল পড়ে রয়েছে। মনিরা মুহূর্তে বুঝে নিল ওগুলো কিসের বোতল।

শিউরে উঠল মনিরা, সর্বনাশ, আবার সে কোন্ কু-ব্যক্তির কবলে পড়ল। তার জীবনটাই কি শুধু এমনি বিপদ আর বিপদে ভরা!

কি করবে মনিরা, এ কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করবে—না এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে? নিশ্চয়ই তার জন্য এ কক্ষ নিরাপদ স্থান নয়, বুঝতে পারল সে।

হঠাৎ নূর কেঁদে উঠল।

মনিরা নূরকে বুকে আঁকড়ে ধরে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু একি! দরজা কখন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে লোকটা চলে গেছে। মনিরা ধাক্কা দিতে লাগলো আর বারবার ডাকতে লাগল—এ দরজা খোল, দরজা খোল, আমার ছেলে কাঁদছে। এই, দরজা খোল।

কিন্তু কোন সাড়াশব্দই এল না বা দরজা খোলার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মনিরা খাঁচায় বন্দী হরিণীর মত ছটফট করতে লাগল। নূর কিছুতেই কান্না বন্ধ করছে না।

অগত্যা মনিরা নূরকে নিয়ে মেঝেতে গালিচার ওপর বসে পড়ল। গোটা দিনটা কেটে গেল নূর কিছু খায়নি, এক্ষণে মায়ের দুধ সে প্রাণভরে পান করতে লাগল।

হাজার চেষ্টা করেও সে বদ্ধ কোঠা থেকে নিজকে বাইরে আনতে সক্ষম হল না মনিরা। নিজের এ ভুলের জন্য অনুতাপ করতে লাগল।

সারা দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে মনিরার দেহ অবসন্ন হয়ে এসেছিল! কখন যে নূরকে বুকে নিয়ে গালিচার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে স্মরণ নেই। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সে। কক্ষে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল। সে

চোখ মেলে তাকাল কেউ যেন দেখতে বা জানাতে না পারে সেভাবে তাকিয়ে দেখল।

চোখ মেলে চাইতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল মনিরার সমস্ত দেহ। সেই বিরাট বপু মেয়েলোকটি— তার সঙ্গে একটি তেমনি বিরাট শরীর বিশিষ্ট লোক। দু'জনের মধ্যে নীচুস্বরে কথাবার্তা হচ্ছিল। আলোচনা যে তাকে নিয়েই হচ্ছে বুঝতে বাকী রইল না মনিরার। কেঁপে ওঠে তার অন্তরটা—হায়, একি বিপদ দিলে খোদা! মনিরা নূরকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

মেয়েলোকটি বলল— দেখলে তো, যেমন কম বয়স, তেমনি রূপের ডালি— কত দেবে বল?

এবার পুরুষটার কণ্ঠ— আট হাজারের বেশি পারব না। কারণ ওকে বাগে আনতে আমার আরও অনেক কাঠ কয়লা পোড়াতে হবে।

মেয়েলোকটি গলার আওয়াজ—কাঠ কয়লা পোড়াতে হবে বলেই তো দশ হাজার, নইলে বিশ হাজারের কমে যেত না। বল পারবে— না অন্য খরিদ্দারকে দেখাব?

লোকটা বুঝি মাথা চুলকাচ্ছে, খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে একটা ঘোৎ ঘোৎ শব্দ, এবার লোকটা বলল— কিছু কম কর বাঈজী দিদি।

কম --চাপাকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল মেয়েলোকটি, তারপর বলল— বেরিয়ে যাও, হবে না।

আরে শুনো বাঈজী দিদি, শুনো। চটো কেন?

আস্তে কথা বল, জেগে উঠবে ছুড়ী।

যাক, তাহলে ঐ দশ হাজার ছাড়া দেবে না?

না, না, না, বরং দু'দিন রেখে আরও বেশি টাকা পাবো। বাচ্চটাকে আগে সরিয়ে ফেলতে দাও---

মেয়েলোকটির কথায় মনিরার হৃদয় কেঁপে উঠল, বলে কি—বাচ্চাটাকে সরিয়ে ফেললে তার দাম আরও বাড়বে! মনিরা কি করবে ভেবে অস্থির হল।

লোকটা বুঝি ভাবছে, দশ হাজারে নিলে ঠকবে নাতো। এবার বুঝি মনস্থির করে ফেলেছে লোকটা, বলল— যাক, দশ হাজার টাকাই পাবে, কিন্তু ছেলেটা তোমাকে রাখতে হবে বাঈজী দিদি।

এর জন্য আবার চিন্তা, এ তো ভাল কথা, বাচ্চাটাকে আর একজনের কাছে দু'পাঁচ হাজারে চালিয়ে নেব—

লোকটা এবার বলল— তাহলে আমি রাজী।

মনিরা এবার আচমকা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল এবং তীব্র কণ্ঠে বলল— না, কিছুতেই তোমরা আমাকে বিক্রি করতে পারবে না। আমি সব কথা পুলিশকে জানিয়ে দেব।

মেয়েলোকটি কটমট করে তাকালো দাঁতে দাঁত পিষে বলল—পুলিশকে জানাবে! পুলিশ কোথায় বাছাধন! পুলিশ কোথায়?

মনিরা নূরকে কোলে আঁকড়ে ধরে বলে উঠল— আমি এসেছি তোমাদের এখানে রাতের মত একটু আশ্রয় পাব বলে। আর তোমরা আমাকে বিক্রি করে টাকা নেবে—এত বড় শয়তান তোমরা?

মেয়েলোকটি রাক্ষসীর মতো হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল— বাঘের গুহায় পা দিয়েছ মেয়ে, আর ফিরে যাবার উপায় নেই। মেয়েলোকটি এবার হাতে তালি দিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটি বিকৃত আকার মেয়েলোক কক্ষে প্রবেশ করে এক পাশে দাঁড়াল।

বিশাল বপু মেয়েলোকটি এবার তাকে ইংগিত করল মনিরার কোল থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে।

দু'হাত প্রসারিত করে বিকৃত আকার নারীটি মনিরার কোল থেকে ঘুমন্ত নূরকে কেড়ে নিতে গেল।

মনিরা অমনি নূরকে বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো—কিছুতেই তোমরা আমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে কেড়ে নিতে পারবে না। যাও, যাও তোমরা---

বিকৃত আকার মেয়েলোকটি তখনও কঙ্কালের মত হাত দু'খানা প্রসারিত করে এগুচ্ছে।

মনিরা পিছিয়ে যাচ্ছে, বুকের মধ্যে তার ঘুমন্ত নূর। সেকি অদ্ভুত দৃশ্য!

মনিরা অসহায়ের মত বাচ্চাটিকে বুকে করে পিছিয়ে যাচ্ছে। আর জীবন্ত কঙ্কালের মত বিকৃত আকার মেয়েলোকটি দু'হাত মেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

মনিরা জানে না পেছন দিকে দাঁড়িয়ে বিরাট বপু মহিলাটি। খপ্ করে মনিরাকে ধরে ফেলল সে, বাঘের থাবায় যেন মেষ শাবক। মনিরার ঘাড়

ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর অতি সহজে মনিরার কোল থেকে নূরকে কেড়ে নিল।

আর্তনাদ করে উঠল নূর।

মনিরার হৃদয় খান খান হয়ে যেতে লাগল, সে নূরের দিকে হাত বাড়ালো।

অমনি ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটা মনিরাকে ধরে ফেলল। লোহার সাঁড়াসির মত ওর হাতখানা মনিরার কোমল হাতের ওপর দাগ কেটে বসে পড়ল, মনিরা শত চেষ্টা করেও নিজের হাতখানা বলিষ্ঠ লোকটার হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলো না।

লোকটা দক্ষিণ হাতে মনিরার হাত মুঠায় চেপে ধরে বাঁ হাতে পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে বিরাট বপু বাঈজী দিদির হাতে গুঁজে দিল।

এবার লোকটা হাঁক দিল— ভজুয়া, ভজুয়া --

অমনি কক্ষে প্রবেশ করল একটা জোয়ান বলিষ্ঠ লোক। হাতে তার একটা কাল কাপড় আর একগাছা দড়ি।

লোকটা মনিরাকে বাঁধতে আদেশ করল।

ভজুয়া মনিরাকে বেঁধে ফেলল। সেই লোকটা এবং বাঈজী দিদিও তাকে সাহায্য করল, নইলে মনিরাকে কাবু করা একজন বা দু'জনের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

মনিরাকে যখন মজবুত করে বেঁধে ফেলছিল, ঠিক তখন বিকৃত আকার মহিলা নূরকে নিয়ে কক্ষ থেকে চলে গেল।

অসহায় মনিরা হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে ঐ কঠিন বাঁধন থেকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হল না।

ঝিন্দ শহরে নেমে এসেছে অন্ধকার ঘনঘটা। রাত গভীর। মনিরাকে নিয়ে একটা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি দ্রুত এগুচ্ছে শহরের শেষ প্রান্তের দিকে।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে দড়ির বাঁধনে টন টন করে উঠছে মনিরার হাতের গিরা আর পায়ের গিট! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মুখে একটা কাপড় গোজা থাকায় নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে মনিরার। তবু নীরবে পড়ে রয়েছে, উপায় নেই নড়ার বা চিৎকার করে কাঁদার। কিন্তু এত দুঃখ-কষ্ট ছাপিয়ে বার বার মনে পড়ছে নূরের কথা। স্বামীর চিহ্নটুকুও বুঝি এবার সে

হারিয়ে ফেলল। নূরের কান্নার সুর এখনও বাজছে তার কানের কাছে। না জানি ওকে ওরা কি করবে—হত্যা করে ফেলবে না তো? তাই বা কে জানে?

পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে গাড়িটা বোধ হয়ে যাচ্ছিলা কারণ ভয়ানক ঝাঁকুনি অনুভব করছিল মনিরা নিজের দেহে। আর কতক্ষণ এমনি করে কাটাতে পারবে, সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। এবার হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়বে মনিরা, ক্রমেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার।

❑

আজ প্রায় বছর হয়ে এলো কায়েস এই অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী। প্রথম প্রথম একটু কিছু খাবার সে পাচ্ছিল। হয়তো কোনদিন শুকনো রুটি কিংবা ভাত। এখন কিছুদিন হলো তাও আর পায় না কায়েস। কেউ আর আসে না বা খাবার দিয়ে যায় না তার কারাকক্ষে। একটা মাটির হাঁড়িতে কিছু পানি ছিল সেই পানি খেয়ে কোনরকমে জীবনে বেঁচে রয়েছে। সে পানির মধ্যেও ছোট ছোট এক রকম কীট জন্মে গেছে। পানির রংটাও পাল্টে সবুজ আকার ধারণ করেছে। তবু চোখ বন্ধ করে তৃপ্তির সঙ্গে সেই পচা দুর্গন্ধযুক্ত পানি পান করে কায়েস।

চেহারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। চোখ দুটো গর্তের মধ্যে বসে গেছে। চোয়াল দুটি উচু হয়ে উঠেছে কেমন বিশ্রীভাবে দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে। মুখে একমুখ দাড়ি, মাথায় জটাধরা একমাথা চুল। আংগুলের নখগুলো মস্ত বড় বড় হয়ে গেছে। হঠাৎ কেউ কায়েসকে দেখলে মানুষ বলে চিনতেই পারবে না। একটা অদ্ভুত জীবের মত দেখতে হয়েছে সে।

মানুষের প্রাণ এত শক্ত, এত কঠিন, এত কষ্টেও সে এখনো বেঁচে আছে— মরে যায়নি।

কিন্তু আর কতদিন সে এই নরক-যন্ত্রণা এমনি করে তিলে তিলে ভোগ করবে। কায়েস জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছে। বাঁচার সখ আর তার নেই। এ অবস্থাতেও কিন্তু কায়েসের মনে সদাসর্বদা মনিব-পত্নী মনিরার কথা

উদয় হচ্ছিল। না জানি সে এখন কোথায়, কেমন আছে। তার গর্ভে সর্দারের সন্তান—না জানি সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তার অবস্থা কেমন আছে। পুত্রসন্তান জন্মেছে না কন্যাসন্তান জন্মেছে কে জানে। বেঁচে আছে না মরে গেছে তাই বা কে জানে! কায়েসের মনে একটা ক্ষীণ আশার আলো মিটমিট প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। তার সর্দারের পত্নী মনিরার গর্ভে কন্যা না জন্মে যদি ছেলে জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে একদিন আবার তার সর্দারের আসন পূর্ণ হবে --অন্ধকার কারাকক্ষে কায়েসের নিষ্প্রভ চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল।

কায়েস যে কক্ষে বন্দী ছিল, সে কক্ষে মাত্র একটা দরজা ও হাওয়া প্রবেশের একটি ছোট গর্ত ছিল। গর্তটাও প্রায় ছাদের কাছাকাছি। সে গর্ত দিয়ে সামান্য আলো আসতো কারাকক্ষে। কখনও কখনও সে গর্তে সূর্যের ক্ষীণ আলোর ছ'টা দেখতে পেত কায়েস। বেশ কিছুদিন এ আলোর রশ্মি দেখতো আবার হয়তো ধীরে ধীরে আলোর ছ'টা মিশে যেত আর দেখা যেত না। কায়েস বুঝতে পারতো মাস পাল্টে যাচ্ছে তাই প্রকৃতির এই পরিবর্তন।

কিন্তু আর কত দিন এই অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করবে। কেউ তো আর আসে না, কেউ তো আর তার সন্ধান নেয় না। তবে কি শয়তানের দল সব মরে গেছে না চলে গেছে এ দেশ ছেড়ে। তাকে হত্যা না করে জীবিত রেখেই চলে গেছে। তবু কায়েস কারও আগমন প্রতীক্ষায় দিন গোনে।

হঠাৎ একদিন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এত দিন তার মাথার উপর গর্তটা যদি আংগুল দিয়েও খুঁড়ে বড় করবার চেষ্টা করত তবু হয়তো সফলতা লাভ করতে পারত। যে কক্ষে কায়েসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেটা যে মাটির নিচে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কায়েস একটু কষ্ট করলে ছাদটা নাগাল পেতে পারে। যদিও সিমেন্ট করা কিন্তু বহু দিনের পুরনো। চুন, বালু, ইট সব লোনা ধরে খসে খসে পড়ছে। কাজেই রোজ কিছু কিছু ভাঙার চেষ্টা করলেও এতদিন সে ঐ গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাবার মত ফাঁক করে ফেলতে পারত।

কায়েসের মনে একটা বেঁচে থাকার বাসনা উকি দিয়ে গেল। এবার সে তার ছাদের গর্তটা ফাঁক করার জন্য চেষ্টা নিল।

দিনরাত অবিরাম কাজ করে চলল কায়েস।

কখন রাত, কখন দিন যদিও বুঝার কোন উপায় ছিল না, তবু ঐ গর্তের সামান্য আলোতে সে বুঝতে পারত এখন রাত বা দিন হয়েছে।

সব সময় আংগুলের নখ দিয়ে লোনাধরা সিমেন্ট আর বালির চাপ খুলে ফেলত। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ত তখনই ঐ পচা দুর্গন্ধময় পানি পান করত। আবার কাজ শুরু করত। আবার যখন ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসত তার শরীরটা তখন মাথার নিচে হাত রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ত। ঘুম ভাঙলে আবার চলত তার কাজ।

❑

মনিরার যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে চোখ মেলে দেখতে পেল একটা খাটের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে তাকে। সমস্ত শরীর ব্যথায় টনটন করছে। মনিরা স্মরণ করতে চেষ্টা করল এখন সে কোথায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সব কথা মনে পড়ল তার। নূরের কথা মনে হতেই উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল সে। না জানি এখন সে কোথায়! এতটুকু কচি শিশু—দুধ ছাড়া কিছু সে খায় না। আহা, কেঁদে কেঁদে গলা বুঝি শুকিয়ে গেছে। মনিরা আকুলভাবে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করল একটা লোক। হাতে তার একটা গ্লাস, মনিরার সামনে এসে দাঁড়াল—এই নাও, এতে দুধ আছে, খেয়ে নাও।

মনিরা মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সারাদিন কিছু খেল না সে, সর্বক্ষণ কাঁদতে লাগল। বিকেলে হঠাৎ সেই লোকটা এসে হাজির হল তার কক্ষে। যে লোকটা বিরাট বপু মহিলার কাছ থেকে তাকে কিনে নিয়েছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে— এ সেই লোক।

মনিরা ওর দিকে তাকিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল।

লোকটা দাঁত বের করে একটু হাসলো, কি ভংঙ্কর কুৎসিত সে হাসি! এবার মনিরার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল— কেমন আছ প্রিয়া!

মনিরার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রি রি করে উঠল। লোকটার কথা তার শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

লোকটা এবার তার বিছানার একপাশে বসে পড়ল। শিউরে উঠল মনিরা। খাটের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল সে। হাত বাড়াল লোকটা মনিরার দিকে— যাবে কোথায়, তুমি যে এখন আমার!

যেমনি লোকটা মনিরাকে ধরতে গেল— অমনি মনিরা খাট থেকে নেমে সরে দাঁড়াল। বুকটা ধক ধক করতে লাগল তার।

লোকটার দু'চোখে লালসাপূর্ণ চাহনি। দু'হাত মেলে এগুতে লাগলো মনিরার দিকে।

মনিরা নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল নয়নে চারদিকে তাকাল। হঠাৎ সে হাতের পাশে অনুভব করল শক্ত একটা জিনিস।

মনিরা হাতের মুঠায় তুলে নিল জিনিসটা— একটা পাথরের ক্ষুদে বাঘ সেটা।

লোকটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

মনিরা পিছু হটতে হটতে দেয়ালে গিয়ে ঠেকে পড়ল, আর কোন্ দিকে সরবে। লোকটা এবার ধরে ফেলবে— মনিরা উপায় না দেখে হাতের পাথরের মূর্তিটা ছুড়ে মারল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে।

মনিরার লক্ষ্য ব্যর্থ হল না, লোকটার মাথায় লেগে ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল কিন্তু বেশিদূর এগুতে না এগুতেই দু'জন লোক মনিরাকে ধরে ফেলল, বলল— পালাচ্ছ কোথায়? দশ হাজার টাকা তোমার দাম।

টেনে হিঁচড়ে মনিরাকে আবার সেই ঘরে নিয়ে এল লোক দু'টি।

মনিরা তাকিয়ে দেখল তার হাতে আহত ব্যক্তি এখনও মেঝেতে বসে কাতরাচ্ছে। রক্তেরাঙা হয়ে উঠেছে তার জামা-কাপড়। কয়েকজন গুন্ডা প্রকৃতির লোক ওর মাথার ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

মনিরা বুঝতে পারল, এটা কোন গুণ্ডাদলের আস্তানা। এখানকার প্রত্যেকটা লোকের চেহারা শয়তানের মত দেখতে। যে লোকটা তাকে কিনে এনেছে এবং তার হাতে আহত হয়েছে, সেই যে এ দলের নেতা বা সর্দার তা বুঝতে বাকী রইল না মনিরার।

লোক দু'জন মনিরাকে পুনরায় সেই কক্ষে এনে পিছমোড়া করে খাটের সঙ্গে বেধে ফেলল।

ততক্ষণে দলপতির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। এবার রক্তচক্ষু নিয়ে তাকাল সে মনিরার দিকে, তারপর গর্জন করে বলল— চাবুক লাগাও! শরীরের চামড়া ছিড়ে ফেল।

হুজুর, চাবুক লাগালে মরে যাবে যে! বলল একটা লোক।

দলপতি হুঙ্কার ছাড়ল— মরুক—

অন্য একজন বলল—হুজুর— দশ হাজার টাকা—

যেতে দাও!

তার চেয়ে ওকে ফেরত দিয়ে দেয়াই ভাল।

হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছ! তাই করব, এমন রাক্ষসী মেয়ে আমি চাইনা। যাও, ওকে আজই চালান করে দাও।

আচ্ছা হুজুর, তাই করব।

করব নয়-কর।

উপস্থিত চাবুকের আঘাত থেকে বেঁচে গেল মনিরা, তার ওপর তাকে আবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তার নূর আছে। মনে মনে খুব খুশি হল সে। বুকের মধ্যে নূরের জন্য তোলপাড় শুরু হয়েছে। কিন্তু কখন নিয়ে যাবে? আর কতক্ষণ পরে? মনিরা ছটফট করতে লাগল।

কিন্তু মনিরা যত সহজে পরিত্রাণ পাবে ভেবেছিল তত সহজে পেল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে ঐ খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। কিছু খেতেও দেয়া হল না।

সন্ধ্যার পর যখন গোটা পৃথিবী ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল তখন মনিরাকে হাত-পা-মুখ বেঁধে একটা ঘোড়ার গাড়িতে তুলে নিল ওরা।

গাড়ি চলতে শুরু করল মনিরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুধু অনুভব করছে সে গাড়িটা কোন উচুনীচু পথ ধরে এগুচ্ছে। প্রচণ্ডভাবে গাড়িখানা নড়ছে আর দুলছে।

বেশ কিছু সময় ধরে গাড়িখানা এমনিভাবে চলার পর এবার মনে হল বেশ সমান পথ ধরে চলতে শুরু করল গাড়িটা। আর কোন রকম ঝাঁকুনি লাগছে না।

মনিরা গাড়ির মধ্যে থেকেই বুঝতে পারছে, যে পথ বেয়ে এখন তাদের গাড়ি চলেছে সেটা জনমুখর রাজপথ। নানা রকম যানবাহনের শব্দ

তার কানে আসছে। সময়টা রাত। গাড়ির ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তার লাইটপোষ্টের আলোও দেখা যাচ্ছে।

বেশ কিছু সময় চলার পর গাড়িখানা থেমে পড়ল। আশায় আনন্দে মনিরার মনের মধ্যে আলোড়ন হচ্ছে। যত দুঃখ-কষ্টই হোক নূরকে সে বুকে ফিরে পাবে, এটাই তার বড় পাওয়া।

গাড়ির দরজা খুলে তাকে বের করে আনা হল। যদিও মনিরার হাতমুখ বাঁধা ছিল তবু দেখতে পেল এটা সেই বাড়ি যে বাড়িতে একদিন মনিরা রাতের মত আশ্রয়ের আশায় প্রবেশ করেছিল। সেই ভীমকায় মহিলার চেহারা মনে পড়তেই মনিরার বুক কেঁপে উঠল, না জানি আবার তার অদৃষ্টে কি আছে!

মনিরাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হল।

সেই কক্ষে, যে কক্ষে মনিরা প্রথম প্রবেশ করে ঐ বিরাট বপুধারিণী নারীটিকে দেখতে পেয়েছিল। মনিরাকে নিয়ে দুটি লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করল।

একজন বলল— একে তিনি ফেরত পাঠালেন।

কর্কশ কণ্ঠে গর্জে উঠল বিরাট বপুধারিণী— ফেরত পাঠাল, কেন, কি হয়েছে?

মহিলার গর্জনে লোক দুটোর বুক থর থরিয়ে কেঁপে উঠল, অন্যজন হাতে হাত কচলে বলল— এমন রাক্ষসী মেয়ে নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের মনিবকে এ আহত করেছে।

দাঁতে দাঁত পিষল বিরাট বপু ধারিণী—কি বললে!

মনিবকে জখম করে দিয়েছে—এই শয়তানী!

তাই নাকি? একটু থেমে বলল মহিলা— একটা মেয়েকে বাগে আনতে পারলো না, এমন পুরুষের বাচ্চা তোদের মনিব। আরে ছোঃ, থুক দেই অমন পুরুষের মুখে। তারপর বিছানার তলা থেকে একতাড়া নোট বের করে ছুড়ে দিল সে লোক দুটোর গায়ে— নিয়ে, যা তোদের মনিবকে দিয়ে দিস। হতভাগাগুলো!

লোক দুটো টাকার তাড়াগুলো দ্রুত হস্তে কুড়িয়ে নিল তারা পালাতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

লোক দুটি বেরিয়ে যেতেই হুংকার ছাড়ল মহিলাটি— শয়তানী, বড্ড বেপরোয়া হয়েছ! জান কার হাতে পড়েছ তুমি?

মনিরা তাকিয়ে দেখল বিরাট দেহধারিণীর দু'চোখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। দাঁত কটমটিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে।

মনিরার মন তখন নূরের জন্য ছটফট করছে। মায়ের প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। আকুলভাবে কেঁদে বলল মনিরা— আমার ছেলে কোথায়? আমার ছেলে?

ছেলে! গর্জন করে উঠল মহিলা— ছেলে নেবে?

হ্যাঁ, আমার ছেলে দাও?

হেসে উঠল ভীমকায় মেয়েলোকটি— ছেলেকে আর পাচ্ছো না।

কেন! কোথায় নূর?

সে এখন চলে গেছে— অনেক দূরে, বুঝেছ?

কোথায় তাকে পাঠিয়েছ তোমরা? কি করেছ তাকে?

বিক্রি হয়ে গেছে— তোমার চেয়ে তার মূল্য আমি অনেক বেশি পেয়েছি! তার দক্ষিণ বাজুতে যে কাল জট রয়েছে, সেই জটই তার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে, বুঝেছ?

মনিরার মনে পড়ল— নূরের দক্ষিণ হাতের বাজুর ওপর কাল একটা জট ছিল, নূরের জন্মের পর মনিরা অবাক হয়েছিল প্রথমে, এমন হয়েছে কেন! নেড়েচেড়ে দেখল সে নূরের সাদা ধবধবে ছোট বাজুর ওপর কাল একটা দাগ ঠিক একটা পয়সার মত। তবে কি সেটা, কোন লক্ষণযুক্ত সন্তান তার? হয়তো কিছু হবে, নইলে আজ এ কথা শুনবে কেন? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল মনিরা— কোথায়, কার নিকট তোমরা বিক্রি করেছ? তোমাকে আমি অনেক অনেক টাকা দেব, আমার সন্তানকে তোমরা ফিরিয়ে এনে দাও।

টাকা, ভিখারিণী দেবে টাকা! কোথায় পাবি টাকা? কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মহিলাটি।

মনিরা তেমনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলল— ওর বাবা লাখ লাখ টাকার মালিক। যত টাকা চাও, তাই পাবে তোমরা। আমার নয়নের মনিকে তোমরা ফিরিয়ে এনে দাও।

আবার মহিলাটি বিকট শব্দে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল । তারপর ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে বলল, ওর বাবা লাখ লাখ টাকার মালিক, আর তুমি ওর মা হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে এতটুকু আশ্রয়ের জন্য-------হাঃ হাঃ হাঃ! হাসিতে ফেটে পড়ল বিশাল বপুধারিণী। হাসি থামিয়ে বলল আবার—

এতক্ষণে হয়তো তোমার সন্তানের রক্তে কাপালিক সন্ন্যাসী তার কালীপূজা শেষ করছে---

শয়তান মেয়ে লোকটার কথা শেষ হয় না, মনিরা তার বাঁধা হাত দুটি দিয়ে চেপে ধরল মেয়েলোকটার গলা— কি বললি! কি বললি পিশাচিনী--

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলোকটা হাতে তালি দিল, অমনি দু'জন বলিষ্ঠ লোক মনিরাকে সরিয়ে নিল।

মেয়েলোকটা তার বিরাট দেহটা নিয়ে ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জন করে উঠলো— নিয়ে যাও! ঐ ঘরে আবার বন্ধ করে রাখ। রাক্ষসী দেখছি পুত্রশোকে ক্ষেপে উঠেছে। আমাকেও হত্যা করতে যাচ্ছিল---দাঁতে দাঁত পিষে বলল আবার—হেমাঙ্গিনীর হাতে পড়েছ। যার হাতে সাতটা জোয়ান পুরুষ ভেড়া বনে যায় তুমি তো একটা পুচকে ছুড়ী! নিয়ে যা, হা করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

বলিষ্ঠ জোয়ান লোক দুটি মনিরাকে একরকম শূন্যে ঝুলিয়েই নিয়ে চলল।

❑

আবার সেই কক্ষ।

মেঝেতে গালিচা পাতা। কতগুলো তাকিয়া ছড়ানো রয়েছে গালিচার একপাশে। কয়েকটা মদের বোতল এপাশে ওপাশে কাৎ হয়ে পড়ে আছে, কাঁচের কয়েকটা গ্লাসও বিক্ষিপ্ত ছাড়ান। কক্ষে তখনও ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে।

মনিরাকে কক্ষে ঠেলে দিয়ে লোক দুটো দরজায় তালা আটকিয়ে চলে গেল।

মনিরা দু'হাতে দরজায় ঝাঁকুনি দিয়ে খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু একচুলও নড়লো না বা দুললো না শালকাঠের দরজাটা।

মেঝেতে পড়ে মাথা আছড়ে কাঁদতে লাগল সে। হায়, একি হল তার! একি সর্বনাশ হল। সব হারাল মনিরা—স্বামী-পুত্র সব। ছোটবেলায়

পিতা-মাতাকে হারিয়েছিল, বড় হয়ে মামাকে হারাল, মামী বেঁচে থেকেও আজ নেই— নেই তার কোন আত্মীয়স্বজন। স্বামী তার স্বাভাবিক মানুষ নয়, তবু ছিল তার পাশে–সেও আজ নেই। একমাত্র নূর ছিল তার সম্বল তাকেও হারিয়েছে। শুধু হারিয়েই যায়নি সে, চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কোন সন্ন্যাসীর হাতে অবোধ শিশু নূর জীবন বিসর্জন দিয়েছে-- -- আর ভাবতে পারে না, মনিরা -----বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

দিনরাত মাথা ঠুকে কাঁদলেও আর সে ফিরে আসবে না। আর তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসবে না। আধো আধো কণ্ঠে মা–মা বলে ডাকবে না। মনিরা নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে লাগল, বুকে আঘাত করে চিৎকার করে ডাকল নূর–নূর, কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না।

ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল মনিরা, সব ভুলে গেছে। নূরের মৃত্যু–সংবাদে সব ভুলে গেছে সে।

কখন যে তার সামনে কে খাবার রেখে গেছে দেখতেই পায়নি মনিরা। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মনিরার দৃষ্টি পানির পাত্রে পড়তেই দু'হাত বাড়িয়ে গেলাসটা তুলে নিল এক নিঃশ্বাসে পানি পান করে শূন্য গ্লাসটা রেখে দিল মেঝেতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল দু'টি লোক, সঙ্গে আর একটি যুবতী এবং সেই বিশাল দেহধারিণী হেমাঙ্গিনী। মনিরা লোক দুটির একজনকে দেখে চিনতে পারল, যে তাকে প্রথম দিন এ বাড়িতে আশ্রয় দেবার আশা দিয়ে নিয়ে এসে ছিল সে অন্যজন— নতুন লোক।

মনিরা যুবতীটির দিকে তাকাল, বেশ বুঝতে পারল তাকেও জোরপূর্বক ধরে আনা হয়েছে। মেয়েটার বয়স মনিরার চেয়েও কিছু কম হবে। দেখতে মনিরার মত এত সুন্দরী নয়, তবে একেবারে মন্দও নয়। মেয়েটার চোখে মুখে অসহায় ভাব। সে যে কেঁদেছে তার মুখ দেখেই বুঝা গেল। যুবতী মনিরার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

হেমাঙ্গিনী লোক দুটিকে লক্ষ্য করে বলল–একেও এই ঘরে বন্দী করে রাখ। খদ্দের এলে আমার সঙ্গে দাম দর হবে।

যুবতীটিও যে মনিরার মতই একজন সর্বহারা এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, সে তার সমস্ত আত্মীয়-পরিজনের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন।

হেমাঙ্গিনী তার অনুচরদ্বয়কে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় আর একবার তীব্র কটাক্ষে মনিরাকে দেখে নিল। সে কি জ্বালাময় বিষভরা চাউনি! মনিরার হৃৎপিণ্ডের রক্ত যেন জমে এলো।

ওরা চলে যাবার সময় ঘরের দরজায় তালাবদ্ধ করে চলে গেল।

এবার মনিরার আর একজন সঙ্গী জুটলো। যা হোক তবু কথা বলার একজন হল।

যুবতী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এগিয়ে গেল মনিরা। আঁচলে নিজের চোখের পানি মুছে ফেলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল—বোন কেঁদো না, আমিও তোমার মত একজন।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে তাকাল যুবতী। এই নরপিশাচদের বাসস্থানে এমন একটা মধুর কণ্ঠস্বর। যুবতী কোন কথা বলতে পারল না, শুধু তাকিয়ে রইলো।

মনিরা বলল—বোন, তুমি কি করে এদের ফাঁদে পড়লে জানতে পারি?

যুবতী আকুলভাবে কেঁদে উঠল, বলল—আমাকে ওরা ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে।

সে কি!

হ্যাঁ, আমার বুড়ো বাপের সঙ্গে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবা আর আমি ফেরার পথে গাড়ির জন্য পথের ধারে অপেক্ষা করছি এমন সময় একটা বুড়োমত লোক এসে বাবাকে কোথায় যেন ডেকে নিয়ে গেল। একটু পর ফিরে এলো লোকটা, বলল—আমি তোমার বাবার বন্ধু, তোমার বাবা আমাদের বাড়িতে অপেক্ষা করছেন, তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি কোনরকম দ্বিধা না করে ওর সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলাম, কারণ একটু পূর্বে বাবা ওর সঙ্গেই যখন গেলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি ওদের ওখানেই আছেন। কাজেই আমার কোন সন্দেহ হল না।

মনিরা ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করল— তারপর?

তারপর আমাকে এই বাড়িতে নিয়ে এলো, বাবাকে তো দেখছি না। ঐ যে ভংকর মেয়েলোকটা, আমাকে সেই আটকে রাখল। বলতে পার কেন আমাকে ওরা এ ঘরে বন্ধ করে রাখল। আর তুমিই বা কে?

মনিরা ব্যথাকাতর কণ্ঠে বলল— আমিও তোমার মত একটা অসহায় মেয়ে, আটকে রেখেছে আমাকেও তোমার মত—উদ্দেশ্য ওদের খুব খারাপ।

কি করবে ওরা আমদের বন্দী করে রেখে?

কোন দুষ্ট লোকের কাছে বিক্রি করবে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, এরা মেয়ে বিক্রির ব্যবসা করে।

সত্যি?

হ্যাঁ, নইলে তোমাকে এখানে ফুসলিয়ে এনেছে কেন?

তোমাকেও বুঝি ফুসলিয়ে এনেছে এরা?

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল—না, আমি নিজেই ভুল করে ফাঁদে পা দিয়েছি।

মনিরা অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবতীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল। এই নির্জন কক্ষে অসহায় অবস্থায় ওকে পেয়ে ভালই হল মনিরার। মনের ব্যথা তবু একটু কমলো, নূরের কথা খুলে বলল—সেই যুবতীর কাছে।

যুবতী নিজের পরিচয় দিল নাম তার সুফিয়া। মনিরা নিজের খাবার সুফিয়াকে খেতে দিল।

সারাটা দিন কেটে গেল, রাত হল।

মনিরা আর সুফিয়া নানারকম দুঃখভরা কথা আলোচনা করল। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিনা— এ নিয়ে কথাবার্তা হল দু'জনের মধ্যে। কিন্তু কোন উপায়ই খুঁজে পেল না ওরা।

রাতে দু'জনে পাশাপাশি গালিচায় শুয়ে পড়ল। নানা রকম ভয় ও দুশ্চিন্তা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে মনিরার মনে। বারবার মনে হচ্ছে নূরের কথা, আর কোনদিন সে নূরকে দেখতে পাবে না, স্মরণ হতেই আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। চোখের পানিতে গালিচা ভিজে চুপসে উঠল।

সুফিয়া মেয়েটা সারাটা দিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। পাশে মনিরা নিদ্রাহীন চোখে চিন্তার জাল বুনে চলেছে। রাত বেড়ে আসছে।

হঠাৎ একটা শব্দে মনিরা চমকে উঠল। না, ও কিছু নয়, দরজাটা ভালভাবে তালা দেয়া আছে কিনা, কেউ বোধ হয় সেটাই পরীক্ষা করে দেখে গেল।

মনিরা আবার শুয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তখন জমাট ব্যথা গুমড়ে কেঁদে মরছে।

❑

লক্ষ্মী ছেলেটির মত শান্ত হয়ে পড়েছে যেন দস্যু বনহুর। ঝিন্দ থেকে ফিরে আসার পর সে একটা দিনের জন্যও দরবারকক্ষে প্রবেশ করেনি বা তার অনুচরগণকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি। কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে দস্যু বনহুর, দস্যুতা যেন ভুলেই গেছে সে।

সর্দারের উদাসীনতা তার অনুচরগণের মনে একটা নৈরাশ্য ভাব এনে দিয়েছে। বিশেষ করে রহমান আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সর্দার যদি এমন হয়ে পড়ে তাহলে দল চলতে পারে না। আর কতদিন রহমান নিজে দল চালাবে।

দস্যু বনহুরের নীরবতায় কতগুলো শয়তান মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে নানা রকম গোপন চোরা কারবার শুরু হয়েছে। নানা রকম গুপ্ত গুণ্ডামি চলছে, যা পুলিশের সুক্ষ্ম দৃষ্টিকেও হার মানিয়েছে। পুলিমহল জানে, আজকাল দেশ শান্ত, নীরব। দস্যু বনহুর নিখোঁজ হওয়ায় দেশে শান্তি বিরাজ করছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা ছিল ঠিক তার উল্টো। দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসীর প্রাণে জাগে আতঙ্ক, সবাই দুর্ভাবনায় রাত কাটায় সত্য, কিন্তু আসলে কি বনহুর অন্যায়ভাবে কারও ওপর উপদ্রব করে বা করেছে? কোনদিন সে কোন অসহায় অনাথের প্রতি আঘাত হানেনি। কোন মহৎ ব্যক্তির ধনরত্ন লুটে নেয়নি। দস্যু বনহুরের প্রচণ্ড থাবা সব সময়ই টুটি টিপে ধরেছে যত অনাচারী অত্যাচারী আর বদমাইশদের, দেশের যত দুষ্টু কুচক্রী দলের ওপরই সে বারবার হামলা করেছে। দলিত মথিত নিষ্পেষিত করে তবেই ক্ষান্ত হয়েছে দস্যু বনহুর। দেশের দুষ্ট লোকদের

দমন করতে গিয়েই সে সকলের কাছে হয়েছে ভয়ঙ্কর, ভয়ের কারণ। পুলিশের কাছেও সে হয়েছে দোষী অপরাধী।

কাজেই দস্যু বনহুর দেশের একজন মহান ব্যক্তি হয়েও সকলের কাছে হয়েছে ভয়াবহ।

সেই ভয়ঙ্কর ভীতিকর লোকটার এহেন নীরবতায় শুধু দেশবাসীই নয়, পুলিশমহলও নিশ্চিন্ত আশ্বস্ত ছিল।

কিন্তু সম্প্রতি শহরে বা শহরের আশেপাশে একটা নতুন চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। নারীহরণ ব্যাপারটা যেন আজকাল আরও বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে এখান সেখান থেকে প্রায়ই মেয়েছেলে চুরি নিয়ে পুলিশ অফিসে ডায়েরী হচ্ছে। পুলিশ এ নিয়ে চূড়ান্ত চেষ্টা করেও এর কোন সমাধান করতে সক্ষম হয়নি।

সেদিন মাহফুজ সাহেবের একমাত্র কন্যা রেবেকা কোন ফাংশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে উধাও হয়েছে, এখন পর্যন্ত পুলিশ তার কোন সন্ধান করতে পারেনি। গোটা শহর তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে কিন্তু কোথাও রেবেকার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ইতোপূর্বে আরও কয়েকটি যুবতী শহরের বুক থেকে নিখোঁজ হয়েছে, তাদেরও কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত।

পুলিশমহল যদিও কিছুদিন বেশ আরামেই দিন কাটাচ্ছিলেন কিন্তু এই নারীহরণ ব্যাপার নিয়ে আবার তারা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শহরের বিশিষ্ট জননায়ক মাহফুজ সাহেবের কন্যাচুরির ব্যাপার নিয়ে পুলিশমহলে আবার আলোড়ন দেখা দিল।

দিনের পর দিন এমনিভাবে মেয়ে-চুরি বেড়েই চলেছে। এসব মেয়ে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় তাদের চালান করা হচ্ছে এর কোন হাদিস পাওয়া যাচ্ছে না! শুধু নারীহরণই নয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চুরিরও যেন একটা হিড়িক পড়ে গেছে। আজ এর ছেলে, কাল ওর ছেলে, ওর মেয়ে— এমনি দু'চার দিন পর পর ছেলে-মেয়ে— চুরি হয়ে যাচ্ছে অথচ পুলিশ আজও তার কোন সুরাহা করতে পারছে না।

ছেলে-মেয়ে ও নারীহরণ লেগেই আছে অথচ এ ব্যাপারটার পুলিশমহল যেন তেমন গুরুত্বই দেয় না। এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবারও কারও সময় নেই যেন। কিন্তু নারীহরণ এবং ছেলে-মেয়ে চুরি যে দেশ ও দশের পক্ষে কত অমঙ্গল এবং ক্ষতিকর তা সত্যি ভাবার বিষয়।

এতদিন ব্যাপারটা গ্রাহ্য না করলেও এবার মাহফুজ সাহেবের কন্যা চুরির যাওয়ায় শহরে তোলপাড় শুরু হল।

অনেকেরই ধারণা, এই নারীহরণ ব্যাপারটা অন্য কারও নয়— দস্যু বনহুরেরই কাজ। সে এখন দস্যুতা ত্যাগ করে নাকি নারীহরণ শুরু করেছে।

কথাটা এক সময় রহমানের কানে এসে পৌছল। জনসাধারণের ধারণা এবং পুলিশমহলেরও সন্দেহ এটা দস্যু বনহুর ছাড়া আর কারও কাজ নয়।

দস্যু হলেও রহমান মানুষ, কথাটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল সে। সত্য হলে সে কিছুই মনে করত না কিন্তু এত বড় একটা মিথ্যাকে সে কি করে স্বীকার করবে! তাদের সর্দারের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এ কুৎসিত ধারণা রহমানকে ব্যথিত করে তুলল।

সেদিন বনহুর তার বিশ্রামকক্ষে অর্থশায়িত অবস্থায় উদাস মনে কি যেন চিন্তা করছিল। নূরী পাশে এসে বসল, বলল—হুর কি ভাবছ?

বনহুর মৃদু হেসে বলল—কিছু না।

আজকাল বনহুর নূরীর সম্মুখে কোন সময় নিজেকে ভাবাপন্ন বা উদাসীন রাখে না। যতটুকু পারে নিজেকে সংযত রেখে নূরীর সাথে হাসি-খুশিভাবে কথাবার্তা বলে। নূরী সত্যি তাকে কত ভালবাসে, মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছে সে। নূরী তাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। আর মনিরার কথা স্মরণ হতেই তীব্র ঘৃণা তার সমস্ত মনকে বিষিয়ে তোলে। মনিরা তাকে ভালবাসার নামে মিথ্যা ছলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল। অবিশ্বাসিনী মনিরা ---একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বনহুরের হৃদয়কে নিষ্পেষিত করে চলে। বনহুর যতই মনিরার স্মৃতি ভুলে যাবার চেষ্টা করে ততই যেন তার মুখখানা বারবার ভেসে ওঠে মনের আকাশে। তাই বনহুর আজকাল প্রায়ই নূরীকে নিজের পাশে পাশে রাখে, নূরীকে দিয়ে ভুলে যেতে চায় মনিরাকে।

বনহুরের সংস্পর্শে নূরী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। আবার তার জীবনধারা হয়েছে স্বচ্ছ স্বাভাবিক। হাসি-গানে মুখর হয়ে উঠেছে নূরী!

নূরীর জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল বনহুর, এখন সে চিন্তা আর নেই। নূরী আবার স্বাভাবিক জীবন লাভ করেছে— এটা তার চরম আনন্দ। তাই বনহুর কোন সময় নূরী মনে ব্যথা পায়— এমন ধরনের কথা বলে না বা সে ধরনের কাজ করে না।

নূরীর আগমনে বনহুর মনের চিন্তা দূরে ঠেলে দিয়ে বলল—নূরী, তুমি আমাকে অনেক ভালবাস, না?

নূরী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিমানভরা কণ্ঠে বলল—এ কথা তুমি আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা কর কেন?

শুনতে ভাল লাগে নূরী।

কি জানি, এবার ফিরে আসার পর তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

কেমন হয়ে গেছি নূরী? মন্দ না ভাল?

অনেক ভাল।

বেশ।

তার মানে।

মানে তোমার ভাল লাগাই যে, আমার ভাল লাগা, আমার আনন্দ নূরী। যাক, চলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

নূরীর হাত ধরে বনহুর তার পাতালপুরীর গোপন আস্তানা থেকে সুড়ঙ্গপথে এগুতে থাকে।

হাজার ফিট মাটির তলায় দস্যু বনহুরের গোপন আস্তানা। কান্দাই বনে আস্তানা থাকাকালীন বনহুর এ ভূগর্ভে গোপন আস্তানা তৈরি করেছিল। লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে এ আস্তানা তৈরি করতে!

বনহুরের এ আস্তানা এমন জায়গায় যেখানে কোনদিন পুলিশ বা সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। অদ্ভুত কৌশলে তৈরি এ আস্তানাটি।

মিঃ জাফরী যখন পুলিশ ফোর্স নিয়ে বনহুরকে কান্দাই বনের আস্তানায় হামলা করেছিলেন, তখন বনহুর তার এই পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় নিশ্চিন্ত মনে সরে পড়েছিল। মিঃ জাফরী এবং তাঁর দলবল অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও বনহুরকে খুঁজে পাননি।

এই সেই আস্তানা।

নূরী আর বনহুর যখন বাইরে এসে পৌঁছল তখন পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। বনের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ, পূর্ণচন্দ্রের জোছনার আলো বনভূমিতে সোনালী আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। একটা নির্মম স্নিগ্ধ হাওয়া সাদর সম্ভাষণ জানাল নূরী আর বনহুরকে। বনহুরের শরীরে স্বাভাবিক ড্রেস। সাদা ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবী। বড় সুন্দর লাগছিল ওকে। পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে বনহুর আর নূরী!

অদূরে পাহাড়িয়া নদী কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে।

বনহুর আর নূরী নদীতীরে এসে দাঁড়াল। নদীর উচ্ছল জলরাশির বুকে জোছনার রূপালী আলোর ছ'টা নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে। কতগুলো পদ্মফুল দোল খাচ্ছে সেই রূপালী আলোর বন্যায়। অপূর্ব দৃশ্য!

বনহুর আর নূরী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক অপরূপ দৃশ্য তাকিয়ে দেখতে লাগল। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। চারপাশে বৃক্ষরাজি। সামনে পাহাড়িয়া নদী।

নূরীর দক্ষিণ হাতখানা বনহুর হাতের মুঠোয় চেপে ধরল, তারপর আবেগভরা কণ্ঠে ডাকল–নূরী!

এমন করে বনহুর কোনদিন তাকে ডাকেনি। নূরীর মনে দোলা লাগল। নূরী ছোটবেলা থেকে ওকে দেখে এসেছে; কিন্তু আজ যেন নতুন করে দেখতে পাচ্ছে। কি বলতে চায় সে তাকে? নূরী জবাব দেয়—বল?

নূরী, মেয়েরা সব পারে, না?

নূরী হেসে বলল—ভাত রাঁধা থেকে দস্যুবৃত্তি পর্যন্ত সব পারে।

তা বলছি না নূরী।

তবে কি?

নারী ছলনাময়ী–এ কথা সত্যি, না?

কেন, আমি কি তোমার সঙ্গে কোনরকম ছলনা করেছি? অভিমানে নূরীর কণ্ঠ ভরে ওঠে।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল—একমাত্র তুমিই সত্য নূরী। তোমার ভালবাসাই সত্য----

নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে মধুর কণ্ঠে বলল–এত দিনে তোমার মনের কথা পেলাম হুর! তোমার অন্তরের কথা পেলাম!

বনহুর আর নূরী নদীতীরে কোমল দুর্বাঘাসের ওপর বসল। কতদিন পর আবার তারা এভাবে নদীতীরে বসার সুযোগ লাভ করল। বনহুর নূরীর চিবুক উচু করে ধরে বলল–নূরী, সেই গানটা এবার গাও , যে গানটা তুমি আগে গাইতে।

নূরীর মনে আনন্দের উৎস, বনহুরকে এত আপন করে সে যেন কোনদিন পায়নি। যতই সে ওকে নিজের করে পেতে চেয়েছে ততই যেন বনহুর সরে গেছে দূরে, আরও দূরে। আজ নূরী গায় গান, অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে গায়।

নূরীর গানের সুর শুধু বনহুরের মনেই দোলা জাগায় না, দোলা লাগে ঘন বনের শাখায়, দোলা লাগে জোছনাভরা পাহাড়িয়া নদীর উচ্ছল জলরাশির বুকে। দোলা জাগে প্রকৃতির বুকে।

বনহুর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে নূরীর মুখের দিকে। নূরী বনহুরের হাতখানা তুলে নেয় নিজের হাতে।

❑

জটাজুটধারী দু'জন সন্ন্যাসী দ্রুত পাহাড়িয়া পথ ধরে গহন বনের দিকে এগুচ্ছে। শরীরে তাদের ভস্মমাখা। ললাটে চন্দনের তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দক্ষিণ হাতে লোহার চিমটা। দু'জনের কাঁধেই এক একটা ঝোলা। সামনের সন্ন্যাসীর হাতে ঝোলার মধ্যে মনিরার নয়নের মনি নূর।

নূরকে দুধের সঙ্গে সামান্য ঘুমের ঔষধ খাইয়ে দেয়া হয়েছে। তাই নূর ঝোলার মধ্যে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

সন্ন্যাসীদ্বয় দ্রুত এগুচ্ছে।

পূর্ণিমা রাতের তৃতীয় প্রহরে তাদের মা কালিকা পূজা। প্রতি পূর্ণিমা রাতেই এই সন্ন্যাসীদ্বয় যেখান থেকে হোক একটি নরশিশু সংগ্রহ করে আনে। গহন বনের মধ্যে বাস করে এক কাপালিক সন্ন্যাসী। তার সামনেই হাজির করে ওরা সেই শিশুকে। কাপালিক ঐ শিশুকে কালীর চরণে সমর্পণ করে সিদ্ধিলাভ করে। শিশুটিকে কালীদেবীর সামনে বলি দেয়া হয়, তারপর সেই রক্ত এক নিঃশ্বাসে পান করে কাপালিক। তখন তার সাধনা জয়যুক্ত হয়।

প্রতি মাসে যেখান থেকেই হোক একটি নিখুঁত শিশু তাদের চাই। এবং সে শিশুর শরীরে কোন সংকেতপূর্ণ চিহ্ন থাকতে হবে।

এই নর–রক্তপিপাসু কাপালিকের জন্য প্রতি মাসে পূর্ণিমা রাতে কালীপূজার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এ ধরনের নিখুঁত এবং শরীরে কোনো সংকেত চিহ্নযুক্ত শিশু সংগ্রহ করে আনার জন্যই এই সন্ন্যাসীদ্বয় অহরহ ঘুরে বেড়ায়।

চুরি করে হোক, দস্যুতা করে হোক, অর্থ দিয়ে হোক, শিশু তাদের চাই!

এবার বহু অনুসন্ধান করেও পূর্ণিমা রাতের কালী পূজার জন্য কোন শিশু সংগ্রহ করতে না পারায় সন্ন্যাসীদ্বয় বিফল মনে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একটা লোকের কোলে নূরকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল সন্ন্যাসীদ্বয়। তারপর ওর পিছু লেগেছিল, এবং নূরকে বহু টাকা দিয়ে কিনে নেয় ওরা।

অবিরাম গতিতে পথ চলছিল সন্ন্যাসীদ্বয়।

ঝিন্দ শহর থেকে বসুন্ধরা পর্বত, তারপর ভগগদিয়া নদীতীর, তারপর আরও কত বন-পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে সন্ন্যাসীদ্বয় এগিয়ে চলেছে।

মাঝে কয়েকদিন কেটে গেছে।

নূর জেগেছিল, একবার নয়, কয়েক দিনের মধ্যে অনেকবার—আবার তাকে ঔষধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

অবোধ শিশু নূর জাগলেই কাঁদতে শুরু করে। মায়ের জন্য চারদিকে তাকায়, কথা সে বলতে শেখেনি এখনও। বয়স মাত্র আট-ন' মাস হবে। শুধু মাকেই চিনেছিল সে।

ঘুমের ওষুধের গুণ নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে ওঠে নূর। কাঁদতে শুরু করে, তখন নরপিশাচদ্বয় আবার তাকে কিছু দুধ খাইতে দেয়, সঙ্গে থাকে একটু ঘুমের ওষুধ। চতুর শয়তানদ্বয় লক্ষ্য রাখে, যেন শিশুর কোন ক্ষতি না হয় বা মরে না যায়। তাহলে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাপালিক বাবাজীর পূজা না হলে তাদের গর্দান যাবে। কাজেই নূরের যেন কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে ছিল সন্ন্যাসীদ্বয়ের নিপুণ দৃষ্টি।

❑

এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশ।

বন, নদী, প্রান্তর, পাহাড়, পর্বত পেরিয়ে সন্ন্যাসীদ্বয় তাদের কাপালিকের আশ্রয়ে পৌঁছতে সক্ষম হল। আজ দোল পূর্ণিমা। নরশিশুর রক্তে কাপালিক তার কালীমায়ের চরণ রাঙা করবে।

সন্ধ্যা থেকে কাপালিকের সাধনা শুরু হয়েছে। সবাই নরবলি দিয়ে থাকে অমাবশ্যা রাতে, আর এই কাপালিক নরবলি দেয় পূর্ণিমা রাতে। তার কালীমায়ের নাকি নির্দেশ রয়েছে।

কাপালিকের যজ্ঞ শুরু হবার মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে এই সন্ন্যাসীদ্বয় নূরকে নিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। বড়ই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে সন্ন্যাসীদ্বয়। এ ক'দিন অবিরাম পথ চলেছে তারা।

নূরকে দেখে কাপালিক খুশি হল।

কিছুক্ষণ পূর্বেই কাপালিকের চোখমুখ হতাশায় ভরে উঠেছিল। এবার বুঝি তার যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যাবে! সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তবু তো কোন শিশু নিয়ে তার অনুচরদ্বয় ফিরে এলো না। এক্ষণে তার মনমত শিশু পেয়ে আনন্দে কাপালিকের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে ওঠে। তার চেয়েও শুভ নিদর্শন শিশুর হাতে মঙ্গলজট রয়েছে। এবারের নরবলি মা কালী মনপ্রাণে গ্রহণ করবেন!

যজ্ঞ শুরু হয়েছে।

ভস্মমাখা কাপালিকের সামনে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। বেদীর ওপর জমকালো পাথরের তৈরি কালীমূর্তি। দক্ষিণ হাতে সুতীক্ষ্ণধার খর্গ, বাম হাতে নরমুন্ডু। অন্য দুটি হাতে শঙ্ক আর চক্র রয়েছে। লকলকে রক্তরাঙা একটি জিহ্বা। চোখ দুটি সোনার তৈরি। অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান জিহ্বা। উজ্জ্বল আলোয় কালীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

মাথায় জট, শরীরে বাঘের চামড়াপরা কাপালিক অদ্ভুত শব্দে মন্ত্র পাঠ করে চলেছে। বাঘের চামড়ার ওপর বসা রয়েছে সে।

সামনের বেদীর ওপর অন্য এক সন্ন্যাসী শিশু নূরকে কোলে করে বসে আছে। নূর দু'হাত নেড়ে খেলা করছে। অত্যন্ত নিদ্রার জন্য এখন তার চোখের ঘুম চলে গেছে। এখানে পৌঁছার পরই খুব কেঁদেছিল, সন্ন্যাসীদ্বয় জোর করে বেশ কিছুটা দুধ ওকে খাইয়ে দিয়েছে, তাই চুপচাপ খেলা করছে।

নূরের অপূর্ব সুন্দর নাদুস-নুদুস চেহারা দেখে কাপালিকেরই জিভে পানি এসে যাচ্ছিল। মা কালীর জিভে যে রস আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাপালিক খুশিতে ডগমগ হয়ে মন্ত্রপাঠ করছে।

রাত দ্বিপ্রহর তখন, যজ্ঞশেষে নূরকে কালী দেবীর চরণে বলি দেয়া হবে।

অগ্নিকুন্ডের উজ্জ্বল আলোতে গোটা বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠেছে। আকাশ–বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে ধূপের গন্ধে। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখন সেখানে।

সন্ন্যাসীর কোলে নূর এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কচি হাতখানা ঝুলে পড়েছে একপাশে। মাথাটা কাৎ হয়ে সন্ন্যাসীর বুকে লেগে রয়েছে। স্বপ্নের ঘোরে নূর ফিক্ কিক্ করে হাসছে। কখনও বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নূরের কচি মুখখানা পবিত্র ফুলের মত সুন্দর লাগছে।

সন্ন্যাসী বাবাজী মন্ত্রপাঠ করে চলেছে।

❑

এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ হুর? রাত কত হল জান, চল এবার ফেরা যাক।

তাজের পিঠে বসে নূরী আর বনহুর ছুটে চলেছে অজানার পথে। নূরী বনহুরের দক্ষিণ হাতের ওপর হাত রেখে কথাটা বলল।

বনহুরের দক্ষিণ হাতে তখন তাজের লাগাম ধরা রয়েছে; বাঁ হাতে নূরীকে ধরে রেখেছে সে।

জোছনাভরা পৃথিবী।

বনহুর আর নূরীর মধ্যে নদীতীরে বসে বসে গল্প হচ্ছিল। বনহুর বলছিল—চল নূরী দূরে–অনেক দূরে কোথাও যাই।

নূরী বলেছিল–কোথায় যাবে হুর?

যেদিকে দু'চোখ যায় চল সেইদিকে যাই।

বনহুরের প্রস্তাবে নূরী অমত করতে পারেনি।

তাজের পিঠে বনহুর আর নূরী উঠে বসেছিল। জোছনাভরা রাত। আলোর বন্যায় বসুন্ধরা যেন স্নান করে চলেছে।

বনহুর আর নূরী তাজের পিঠে ছুটে চলেছে! রাত বেড়ে আসছে সেদিক খেয়াল নেই কারও। হঠাৎ বলে উঠল নূরী—হুর, এখন রাত গভীর, চল ফেরা যাক।

উঁহু, আজ আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না নূরী।

আমারও না। তবে আর কত দূর যাবে শুনি?

যতদূর মন চায়।

বেশ চল।

আজ মনিবের আনন্দে অশ্ব তাজও যেন আত্মহারা। দিশেহারা ভাবে সেও এগুচ্ছে। কোন বাধাবিঘ্নই আজ তাজের পথ রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

প্রান্তর ছাড়িয়ে এবার এক নতুন বনে প্রবেশ করল বনহুরের অশ্ব। নূরী বলল—অজানা অচেনা এক বনে এত রাতে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না হুর।

কেন, ভয় হচ্ছে তোমার?

না, তুমি তো জান, আমার হুর পাশে থাকলে আমি যমকেও ভয় করি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর বলে উঠল—নূরী, দেখ বনের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল নূরী—দূরে, অনেক দূরে গভীর বনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত আগুনের শিখা। নূরী বলল—চল হুর। আর যেয়ে কাজ নেই।

কিন্তু ওখানে অমন আগুন জ্বলছে কেন?

হয়তো কোন শিকারীর দল শিকার করতে এসে বনের মধ্যে রাত হয়ে যাওয়ায় আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে নিজেদের হিংস্র জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

তাও হতে পারে কিংবা কোন... যাক, চল দেখে আসি আসল ব্যাপারটা কি!

আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, যদি শিকারীদল না হয়ে অন্য কোন দস্যুদল হয়?

মোকাবিলা হবে।

তুমি যে নিরস্ত্র?

ততক্ষণে বনহুরের অশ্ব অগ্নিকুন্ড লক্ষ্য করে দ্রুত এগুতে শুরু করেছে।

বনহুর আর নূরী যতই এগুচ্ছে ততই অগ্নিকুণ্ড স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

এবার বনহুর অশ্বের গতি কমিয়ে নিল।

কারণ সে জানতে চায় কিসের আগুন ওটা, কে বা কারা রয়েছে সেখানে? অশ্বপৃষ্ঠ থেকেই এবার লক্ষ্য করল অগ্নিকুণ্ডের পাশে একজন জটাজুটধারী বসে আছে। আর দু'জন দাঁড়িয়ে, কি যেন করছে ওরা।

হঠাৎ নূরী তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—হুর দেখ, দেখ, একটা ছোট্ট শিশুকে একজন উবু করে ধরে আছে।

চমকে উঠল বনহুর, এতক্ষণ সে তা লক্ষ্যই করেনি। ওপাশে এক সন্ন্যাসী একটি শিশুকে উবু করে ধরে রয়েছে। আর এক জন একটা খর্গ তুলে ধরেছে। হয়তো এক্ষুণি শিশুটাকে হত্যা করা হবে! যে সন্ন্যাসী মন্ত্রপাঠ করছে তার সামনে বেদীর ওপর একটা জমকালো কালিমূর্তি।

বনহুর মুহূর্তে বুঝে নিল ব্যাপারটা, সে নূরীকে লক্ষ্য করে বলল–নূরী, তুমি এখানে থাক। তারপর অশ্ব থেকে নেমে দ্রুত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে অগ্রসর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খর্গধারী সন্ন্যাসীটার ওপর।

আচমকা আক্রমণে খর্গধারী উবু হয়ে পড়ে মাটিতে। ছিটকে পড়ল ওর হাতের খর্গ।

বনহুর খর্গধারীর বুকে চেপে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে কাপালিকের মন্ত্র থেমে গেল, চট করে উঠে কুড়িয়ে নিল ভূপতিত খর্গখানা, ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের ওপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর লাফিয়ে সরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে কাপালিকের হাতের সুতীক্ষ্ণধার খর্গ বিদ্ধ হলো ভূপতিত সন্ন্যাসীর মাথায়। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল সন্ন্যাসীর মাথাটা। রক্তের বন্যা ছুটলো, টু শব্দ করার মত সময় পেল না সে।

প্রথম সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে দ্বিতীয় সন্ন্যাসী নূরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, বনহুর তাকে ধরে ফেলল, তারপর প্রচণ্ড এক ঘুষিতে ধরাশায়ী করল।

কাপালিক তার অনুচরটির রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত মাথাটার দিকে তাকিয়ে একটু হকচকিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর বেদীর ওপর উঠে কালীমূর্তির হাত থেকে ধারালো খর্গটা তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশালদেহী কাপালিকের ওপর।

সে কি ভীষণ ধস্তাধস্তি!

রক্তপিপাসু কাপালিকের শরীরে কি অসীম শক্তি। বনহুর তাকে সহজে কাবু করতে সক্ষম হচ্ছে না। কাপালিকের হাতে পূর্বের খড়গটা রয়েছে। কাপালিক আঘাত করছে বনহুর, তার খড়গ দ্বারা প্রতিরোধ করে চলেছে। বনহুরের আঘাতও অতি কৌশলে প্রতিরোধ করছে কাপালিক!

ওদিকে নূর মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মুখটা তার কাপড় দিয়ে বাঁধা কাঁদবার শক্তি নেই।

অপর সন্ন্যাসী এই সুযোগে পুনরায় সরে পড়ার চেষ্টা করতেই নূরী তার খোপা থেকে বিষযুক্ত সুতীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছোরাখানা তুলে নিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল।

নূরীর লক্ষ্য অব্যর্থ, ক্ষুদ্র ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ হল পলাতক সন্ন্যাসীর পিঠে। একটা তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীটি। কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করে স্থির হয়ে গেল তার দেহটা।

নূরী নিজেকে রক্ষার জন্য সদাসর্বদা একটি বিষযুক্ত তীক্ষ্ণধার ছোরা রাখে নিজের খোঁপায় গুজে। বিপদে পড়লে সে ওটা ব্যবহার করে। আজ নূরীর বিষযুক্ত ছোরাখানা খুব কাজে লাগল।

যতই শক্তিশালী লোকই হোক না কেন, দস্যু বনহুরের কাছে পরাজয় বরণ না করে উপায় নেই। নররক্তপিপাসু কাপালিক বনহুরের হাত থেকে বেশিক্ষণ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হল না। বনহুরের হাতের খড়গ তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল।

বিরাট জটাজুটভরা মাথাটা কাপালিকের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল দূরে। রক্তে রাঙা হয়ে গেল বনভূমি।

অগ্নিকুন্ডটা তখনও দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

শক্তিশালী কাপালিকের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বনহুর অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিল। সাদা পাঞ্জাবীটা ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে। স্থানে স্থানে ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। কোথাও বা রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। পাজামার অবস্থাও তাই। বনহুর বাঁ হাতে ললাটের ঘাম মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বনহুরের নিঃশ্বাস তখনও দ্রুত বইছে। চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

নূরী অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে ছুটে এসে বুকে তুলে নিল নূরকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বনহুরের পাশে–হুর, শিগগির এর মুখের বাঁধন খুলে দাও।

বনহুর তার হাতের সুতীক্ষ্ণধার খড়গ ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর দ্রুতহস্তে শিশুর মুখের বাঁধন খুলে দিল!

মুখের বাঁধন মুক্ত হওয়ায় চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল শিশু নূর।

অগ্নিকুন্ডের উজ্জ্বল আলোতে বনহুর আর নূরী শিশুর অপরূপ সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হল। নূরী বুকে আঁকড়ে ধরে সস্নেহে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলল–দেখ, দেখ–কি সুন্দর শিশুটি।

যদিও বনহুরের শরীর-মন দু'ই ক্লান্ত তবু নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগল তার মনে, বড় মায়া হলো। শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল–ভাগ্যিস ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম নূরী, তাই রক্ষে। নইলে এতক্ষণ এর দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..যেমন ঐ পাপিষ্ঠ কাপালিক সন্ন্যাসীর মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। বনহুর তাকাল সন্ন্যাসীদের মৃতদেহের দিকে।

নূরী বলল—এ কারণেই বুঝি তোমার মন আজ এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল?

সত্যি নূরী, অদ্ভুত এ ব্যাপার। জানি না একি কাণ্ড, আজ কেন আমার মন আমাকে এভাবে গহন বনের মধ্যে এই স্থানে টেনে আনল!

নূরী শিশুটাকে বুকে চেপে ধরে বলল—সবই খোদার লীলা!

শিশু নূর তখন নূরীর বুকে মুখ লুকিয়ে শান্ত হয়ে এসেছে। ভাবছে এতক্ষণে সে তার মাকে ফিরে পেয়েছে।

বনহুর আর নূরী ফিরে চলল।

নূরীর কোলে শিশু।

বনহুর এবার সংযতভাবে অশ্ব চালনা করছে।

পেছনে পড়ে রইলো বটবৃক্ষতলে পাষাণ প্রতিমা কালী দেবীর জমকালো মূর্তি। তার পদতলে তিনটি সন্ন্যাসীর রক্তমাখা দেহ— রক্তপিপাসু মা কালী দেবী আজ শিশুর রক্ত পান না করে করলো তার ভক্তদের রক্তপান!

❑

এদিকে নূরকে যখন বলির জন্য প্রস্তুত করে নেয়া হচ্ছিল ঠিক তখন ঝিন্দ শহরের একটি গোপন কক্ষে বন্দিনী মনিরা পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখির মত ছটফট করছিল। মায়ের মনে একটা ভীষণ আলোড়ন শুরু হয়েছিল। কেন যেন মনের মধ্যে ভীষণ চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। বার বার নূরের কচি মুখখানা ভেসে উঠছিল তার মানসপটে। মনিরা কি করবে, কি করে মনকে শান্ত করবে, তাই খোদার কাছে তুলে দোয়া চাইতে বসেছিল, হে দয়াময়, আমার নূরকে তুমি রক্ষা কর। তুমি ছাড়া ওকে দেখার কেউ নেই। হে করুণাময়, তুমি আমার নূরকে বাঁচিয়ে নিও...

মনিরা যখন সন্তানের মঙ্গল কামনায় খোদার কাছে করুণা ভিক্ষা করছিল তখন নদীতীরে নূরীর পাশে বসে বনহুরে মন উতলা হয়ে উঠছিল। বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। তাই নূরীকে নিয়ে তাজের পিঠে বসেছিল। একটা অজানিত টানে ছুটে চলছিল বনহুর কোন্ অজানার পথে।

গহন বনে কাপালিক সন্ন্যাসীর কোলে বলির জন্য অসহায় নূর। খড়গহস্তে দণ্ডায়মান সন্ন্যাসী। মন্ত্রপাঠরত রক্তপিপাসু কাপালিক। সামনে জমকালো কালীমূর্তি, লকলকে জিহ্বা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে।

অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে আসছে বনহুর আর নূরী।

বদ্ধকক্ষে অশ্রুসিক্ত নয়নে দু'হাত তুলে দোয়া করছিল মনিরা।

সবকিছুর সঙ্গে একটা অদ্ভুত সংযোগ ছিল। অপূর্ব সে যোগাযোগ। কখন যে মনিরা জায়নামাযের ওপর ঢলে পড়েছে খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙতেই সূর্যের আলো তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল পাশের ক্ষুদ্র জানালাটা

দিয়ে। ভোরের সূর্যের এক টুকরা আলো এসে পড়ছিল তার মুখে। মনিরা হৃদয়ে যেন একটা শান্তি অনুভব করল।

মনিরা জায়নামায থেকে উঠে দাঁড়াল। আজ যেন মনটা তার অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। ওখান থেকে আকাশের যতটুকু দেখা যায় প্রাণভরে তাই দেখতে লাগল। ঐ আকাশের তলায় কোথাও রয়েছে তার নূর।

মনিরা যখন ক্ষুদ্র জানালায় দাঁড়িয়ে নূরের কথা ভাবছে, তখন নূরকে নিয়ে বনহুর আর নূরী মেতে উঠেছে।

শিশু নূরকে কোলে করে বনহুরের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল নূরী, হেসে বলল–দেখ হুর কে এসেছে!

হাই তুলে গা মোড়া দিয়ে চোখ মেলে তাকাল বনহুর—কে?

নূরী হেসে বলল–মনি।

মুহূর্তে বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। মনি তার মনিরাকেও সে মনি বলে ডাকত। একটা ঘৃণা তার সে নামকে চিরতরে বিষাক্ত করে দিয়েছে। মনিরা ব্যভিচারিণী, ভ্রষ্টা, অন্যের সন্তান তার পেটে জন্মগ্রহণ করেছে। মনিরা তাই চিরদিনের জন্য মুছে গেছে তার মন থেকে....

নূরী হেসে বলল–কি হলো হুর? অমন গম্ভীর হয়ে পড়লে কেন? এ নামটা তোমার পছন্দ হলো না বুঝি?

বনহুর এবার মুখ তুলে তাকাল নূরীর দিকে। দিনের আলোয় স্পষ্টভাবে এই প্রথম সে দেখল নূরকে। বড় ভাল লাগল ওকে। হাত বাড়িয়ে নূরের হাতখানা ধরে মৃদু নাড়া দিয়ে বলল–না জানি কার সন্তান, কে ওর বাবা-মা। নূরী, কেন মায়া বাড়ছে?

সেকি হুর, তুমি একি বলছ! যারাই ওর বাবা-মা হোক আমরা তো; আর চুরি করতে যাইনি বা কেড়েও আনিনি। নিয়তির চক্রে যখন ও আমাদের হাতে এসে পড়েছে তখন বুকে তুলে নেব না? তুমি যাই বলো হুর, মনিকে আমি আর কাউকে দেবো না।

বনহুর এবার রাগত কণ্ঠে বলে উঠল—মনি—মনি—ঐ নাম ছাড়া আর নাম নেই?

কেন এ নাম তোমার এত অপছন্দ? আমার কিন্তু এ নামটা বড় ভাল লাগছে।

বেশ রাখ! গম্ভীর কণ্ঠে বলল বনহুর।

তাই রাখলাম। বলল নূরী।

❑

নূরের নাম বদলে গেল—নাম হলো মনি। নূরীর নয়নের মনি।

মনিকে পেয়ে নূরী আনন্দে আত্মহারা। সদা-সর্বদা ওকে নিয়েই মেতে থাকে সে। নাওয়া, খাওয়া, গোসল করানো, বুকে নিয়ে ঘুম ঘুমপাড়ান যতকিছু সব করে নূরী। মনিকে ছাড়া নূরীর যেন এক মুহূর্ত আর চলে না।

মনিকে পেয়ে বনহুর যে খুশি হয়নি তা নয়। তাদের নীরস জীবনে মনি যেন একটা নতুন আস্বাদ এনে দিয়েছে।

সেদিন নূরী মনিকে নিয়ে আনন্দে মেতে ছিল। কাজল পরিয়ে দুধ খাইয়ে কোলে নিয়ে দোল দিচ্ছিল। এমন সময় বনহুর এসে হাজির হয় নূরীর কক্ষে। মৃদু হেসে বলল—নূরী, মনিকে পেয়ে তুমি দেখছি আমাকে একেবারে ভুলে গেছ?

নূরী মনির মুখে ছোট্ট একটি চুমু দিয়ে দোলনায় শুইয়ে রেখে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে, দু'হাত বাড়িয়ে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে বলল—রাগ করেছ হুর? মনিকে পেয়ে তোমাকে আমি ভুলে যাব—কি যে বলো—তবে ওর জন্য সত্যিই বড় মায়া হয়, ওর তো বাবা-মা কেউ নেই এখানে।

নূরীর চিবুকে মৃদু টোকা দিয়ে বলল বনহুর—তাই তুমিই মা বনে গেছ, না?

হ্যাঁ, তাতে দোষ কি, মেয়েরাই তো মা হয়।

হাসে নূরী, হাসে বনহুর। দোলনায় শুয়ে হাসে মনি, দু'হাত মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে মা, ম্মা, ম্মা!

নূরী বনহুরের গলা ছেড়ে দিয়ে ছুটে যায় দোলনার পাশে, দু'হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় বুকে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দু'খানা।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায় সেখানে।

বনহুর বলে—কি খবর রহমান?

কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

কথা! বেশ চল। একবার নূরী আর মনির মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর।

রহমানও একবার অলক্ষ্যে নূরী আর মনিকে দেখে নেয়। নূরীর হাসি-খুশিভরা সুস্থ জীবন রহমানের মনে আনন্দ দান করে। নূরীকে রহমান প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাই ওর মঙ্গলই সে চায়। মনির জন্য নূরীর নির্দেশমত সে শহর থেকে অনেক কিছু এনে দিয়েছে। দোলনা, খেলনা, দুধ খাবার বোতল, চুষনী অনেক কিছু। নূরীর মুখে হাসি দেখলে রহমানের বুক খুশিতে ভরে উঠে। প্রাণে সে শান্তি পায়।

নূরী আর মনিকে দেখে নিয়ে বনহুরের পেছনে পেছনে সেও বেরিয়ে যায়।

❑

সর্দার, সবাই জানে, এই নারীহরণ ব্যাপারটা আপনারই কাজ। কিন্তু আমি কথাটা শুনেও এত দিন নিশ্চুপ রয়েছি, আপনার মনের অবস্থা বুঝে বলিনি। এখন আর চুপ থাকতে পারলাম না, কারণ শুধু আপনার বদনামই নয়, এটা দেশ ও দশের এক মস্ত বিপদজনক ব্যাপার।

বনহুর নীরবে রহমানের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল, এবার একটা শব্দ করল—হুঁ।

রহমান বলে চলেছে–সর্দার, শহরে আজকাল নারীহরণ আর ছেলেমেয়ে চুরির যে হিড়িক পড়ে গেছে, এসব নারী এবং ছেলেমেয়ে যাচ্ছে কোথায়?

বনহুর সোজা হয়ে বসে বলল—এটা গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। রহমান, তুমি আজই আমার অনুচরগণকে শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দাও। যেন শিগগিরই এর সন্ধান সংগ্রহ করে আমাকে জানায়।

আমি এখনই এর ব্যবস্থা করছি সর্দার।

হ্যাঁ, তাই কর।

এতদিন শুধু আপনার আদেশের প্রতীক্ষায়ই ছিলাম। আজ থেকেই আমরা কাজে নেমে পড়ব।

আর শোন।

বলুন সর্দার।

অনেক দিন চৌধুরী বাড়ি যাইনি, যাবার সুযোগ হয়নি। আমার মায়ের কাছে যেতে চাই।

খুব ভাল কথা সর্দার, আমি তাজকে প্রস্তুত করব?

হ্যাঁ, আজ রাতেই যাব মায়ের কাছে—বনহুর উঠে দাঁড়াল।

রহমান তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

❑

বিরাট বাড়িখানায় শুধুমাত্র একাকিনী মরিয়ম বেগম। ঝি-চাকর যদিও অনেক রয়েছে কিন্তু তবু মরিয়ম বেগম নিজেকে সব সময় অসহায় নিঃসঙ্গ মনে করেন। বৃদ্ধ সরকার সাহেব রয়েছেন বলেই তিনি আজও বেঁচে আছেন। অসুখে ডাক্তার ডাকেন, সেবা-যত্নের জন্য নার্সের ব্যবস্থা করেন। পথ্যা-পথ্যের সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, চিন্তার সময় সান্ত্বনা দেন।

কিন্তু তিনি পুরুষ মানুষ, কতক্ষণ বিবি সাহেবার পাশে পাশে থাকতে পারেন। সংসারের নানা কাজে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। বিরাট সংসারে কত ঝামেলা সহ্য করে তবেই না চৌধুরী সাহেবের বিষয়-আশয় সবকিছু ঠিক রেখেছেন সরকার সাহেব।

রাজ প্রাসাদের মত বাড়ি, গাড়ি, ঐশ্বর্য, দাস-দাসী কোন কিছুর অভাব নেই মরিয়ম বেগমের, শুধু অভাব সন্তান-সন্ততির। একমাত্র পুত্রকে হারানোর পর মনিরাকে পেয়ে কতকটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সেই মনিরাকেও যখন হারিয়ে ফেললেন তখন তাঁর আপন বলে কিছুই রইলো না। সংসার অসহনীয় হয়ে উঠলো তাঁর কাছে। কোনরকমে স্বামী-শোক সহ্য করে চলেছিলেন, মনিরাকে বুকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন—সেই মনিরাও আজ নেই।

শোকবিহ্বলা মরিয়ম বেগম দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছিলেন। একমাত্র সন্তানকে বহুদিন পূর্বে হারানোর পর ভুলেই এসেছিলেন তার কথা, আবার সেই হারানো রত্ন ফিরে পেয়ে হারানোর ব্যথা আরও গভীরভাবে মরিময় বেগমকে বিচলিত করে তুলেছিল। বেশ ছিলেন তিনি। মনির মরে গেছে, আর তো ফিরবে না। কিন্তু সেই মনিরকে আবার কেন পেলেন, আর পেলেনই যদি তবে তাকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে না পেয়ে পেলেন অস্বাভাবিকরূপে। যার জন্য সদা ভয় না জানি কখন কোন মুহূর্তে তার জীবন বিনষ্ট হতে পারে। আজ কতদিন তাকে দেখেননি, তার সন্ধান জানেন না, মরে গেছে না বেঁচে আছে তাও তিনি জানেন না। মায়ের প্রাণ তো, অহরহ সদা ঐ চিন্তা–তার মনির এখন কোথায়, কেমন আছে।

সারাটা দিন তবু কেটে যায় নানা কাজ আর ঝি-চাকরের সঙ্গে, রাতে আর সময় কাটতে চায় না। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের ঘুম কোথায় যে পালিয়ে যায় মরিয়ম বেগম নিজেই বুঝতে পারেন না।

সারাটা রাত ছটফট করে কাটে তাঁর। সারা জীবনের নানা কথা ভেসে ওঠে একটার পর একটা করে মনের আকাশে। কত সুখ-দুঃখে ভরা দিন আর রাতের স্মৃতি—স্বামী-সংসার , পুত্রের কথা— মনিরার কথা।

সেদিন অনেক রাতেও যখন চোখে ঘুম এলো না, তখন মরিয়ম বেগম বালিশটা সরিয়ে রেখে উঠে বসলেন। আজ তাঁর বারবার মনে পড়ছে পুত্রের মুখখানা। মরিয়ম বেগম দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, ইলেকট্রিক লাইটের উজ্জ্বল আলোতে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি মনিরকে।

চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা গুমড়ে উঠল তাঁর। নীরবে, অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল বনহুর। গভীর রাতে মাকে তার ছবির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। বুঝতে পারে তার মায়ের মনের ব্যথা। অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠল বনহুর—মা!

মরিয়ম বেগম চমকে ফিরে তাকালেন।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ছুটে এসে কচি শিশুর মত মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—মা, মাগো!

গভীর আবেগে মরিয়ম বেগম পুত্রকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল, বনহুরের মাথায়। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন মরিয়ম–ওরে নিষ্ঠুর, কোথায় লুকিয়েছিলি এতদিন, একটিবার কি মায়ের কথা স্মরণ হয়নি তোর?

মা, আমি তোমার হতভাগ্য সন্তান। আমি তোমার নরাধম সন্তান। আমাকে তুমি অভিসম্পাত দাও মা। আমাকে তুমি অভিসম্পাত দাও।

এ তুই কি বলছিস? তোকে আমি অভিসম্পাত দেব!

মা, তোমার মত মায়ের সেবা আমি করতে পারি না, একি আমার কম দুঃখ! এর চেয়ে আমার মৃত্যু অনেক ভাল।

মরিয়ম বেগম পুত্রের মুখে হাতচাপা দেন—ওকি কথা বলছিস! আর কোন সময় বলবি না! ওরে, আমি তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকব। কেঁদে ফেলেন মরিয়ম বেগম।

বনহুর মাকে সঙ্গে করে খাটের ওপর এসে বসে পড়ল, নিজের রুমালে মায়ের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলল—কেঁদো না মা। তুমি কেঁদ না! তোমার সন্তান চিরদিন তোমার পাশে বেঁচে থাকবে। বলো মা কেমন ছিলে?

না-মরে বেঁচে আছি বাবা!

ছিঃ ও কথা বলতে নেই মা!

ওরে তুই বুঝবি না আমার হৃদয়ে কি জ্বালা! কই, মনিরার কথা বললি না তো? সে কোথায় আছে, কেমন আছে?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে পড়ল বনহুরের মুখমণ্ডল! ভ্রুকুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মরিয়ম বেগম বললেন—কি, অমন চুপ করে রইলি কেন?

তোমার মনিরা মরে গেছে মা।

মরে গেছে! আমার মনিরা বেঁচে নেই? বলিস কি মনির? আকস্মিক শোকে অধীর হয়ে খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন মরিয়ম বেগম—মনির! মনির! এ তুই কি বলছিস!

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—মরে না গেলেও সে মরে যাবার মতই। লোক সমাজে তার স্থান নেই।

সে কি, কি বলছিস বাবা? আমি বুঝতে পারছি না তোর কথা?

মনিরাকে তুমি পুত্রবধু করে ভুল করেছিলে মা।

কেন, কি হয়েছে মনির?

আজ আর জানতে চেও না মা। তোমার এবার কি প্রয়োজন বল?

আগে বল আমার মা মনিরা কোথায়? কি হয়েছে তার? কেমন আছে সে?

মা, এতটুকু জেনে রাখ, তোমার মনিরা পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে।

তবে তাকে নিয়ে এলি না কেন?

এ প্রশ্ন করলে আমি আর আসব না।

আসবি না! মনিরার কথা জিজ্ঞেস করলে আর আসবি না। বেশ, আমি চুপ রইলাম। বুঝেছি তোদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে।

বনহুরও নিশ্চুপ রইল।

মরিয়ম বেগম বনহুরের মাথায়-পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, কতদিন পর পুত্রকে আজ তিনি পাশে পেয়েছেন।

মা-ছেলে অনেক কথা হল অনেক রাত ধরে।

তারপর এক সময় বিদায় গ্রহণ করল বনহুর।

আজ মরিয়ম বেগম হৃদয়ে অনেকটা সান্ত্বনা পেলেন। একটা দুশ্চিন্তা অহরহ মনের মধ্যে গুমড়ে কেঁদে মরছিল, সেটা আর রইলো না! শুধু এখন চিন্তা মনিরার জন্য।

❑

বনহুর মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে তাজের পিঠে চেপে বসল। বহুদিন পর শহরের রাস্তায় আবার ধ্বনিত হলো সেই অশ্বপদ শব্দ খট্ খট্ খট্.....

জমকালো পোশাক পরে বনহুর তাজের পিঠে ছুটে চলেছে। দু'একজন নাগরিকের কানে এসে পৌঁছল তাজের খুরের শব্দ। কেউ কেউ দেখে ফেলল অন্ধকার রাস্তার বুকে জমকালো অশ্বপৃষ্ঠে কালো একমূর্তি।

পরদিন পত্রিকায় বড় বড় হেডিং এ প্রকাশ পেল "দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাব।"

কথাটা অল্পক্ষণেই মধ্যেই গোটা শহরে প্রচার হয়ে গেল। প্রতিটি নাগরিকের ঘরে পৌঁছে গেল সংবাদটা। পুলিশ অফিসে বসে পত্রিকা পড়লেন পুলিশ অফিসারগণ। দোকানে, পথে, ঘাটে, মাঠে আবার সেই কথা—দস্যু বনহুরের পুনরায় আবির্ভাব ঘটেছে। ধনবানদের হৃদয় উঠল কেঁপে। দুষ্ট নাগরিকদের মনে জাগল আশঙ্কা।

নগরবাসী নারীহরণ এবং শিশুচুরি ব্যাপার নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সকলের মুখেই ঐ কথা, যুবতী মেয়ে হরণ–এটা আর কারও নয়, দস্যু বনহুরের কাজ। এবার দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাবে সন্দেহটা একেবারে বদ্ধমূল হলো। নারীহরণ করেও বনহুরের তৃপ্তি হচ্ছে না, সে আবার নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

বিশিষ্ট ধনবান ব্যক্তি যাদের প্রচুর অর্থ রয়েছে তারা পুলিশের সাহায্য চেয়ে বললেন। যাতে তাদের ধনসম্পদ দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা পায়, এটাই তাদের একমাত্র কামনা।

আজকাল যুবতী নারীরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ছেড়ে আর বাইরে তো যায়ই না, অন্দরমহলেও সদা আশঙ্কা নিয়ে বাস করে।

পুলিশ অফিসে বসে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন সেদিনের পত্রিকা দেখছিলেন। দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাব শুধু নগরবাসীর মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করেনি, পুলিশমহলেও একটা আলোড়ন জেগেছে।

মিঃ হারুন বলেন—ব্যপারটা যত সহজই মনে করুন না কেন, আসলে তা নয়। এখনই একবার মিঃ জাফরীর নিকট গিয়ে পরামর্শ করা প্রয়োজন। শহরের মধ্যে যখন দস্যু বনহুরকে সশরীরে দেখা গেছে তখন নিশ্চয়ই সে শুধু শুধু আসেনি, কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে।

মিঃ হারুনের কথায় বললেন মিঃ হোসেন–মিঃ জাফরীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া একান্ত দরকার।

তখনই মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

মিঃ জাফরীর ওখানে পৌঁছে দেখলেন শহরের ধনকুবের হাবসী মিয়া বসে আছেন। তার সঙ্গে মিঃ জাফরীর কোন গোপন কথাবার্তা চলছে।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন পৌঁছতেই হাবসী মিয়া একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

মিঃ জাফরী হেসে বললেন–আপনি নিঃসন্দেহে কথাবার্তা বলুন, এরা আমাদের পুলিশের লোক।

অবশ্য মিঃ হারুন এবং হোসেনের শরীরে তখন সাধারণ ড্রেস ছিল।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনের সঙ্গে হাবসী মিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ জাফরী।

হাবসী মিয়ার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিংবা কিছু বেশিও হতে পারে। জাতিতে তিনি কাফ্রি। তিনি কাঠের ব্যবসা করে এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক টাকা-পয়সা করে ফেলেছেন। আফ্রিকা থেকে তিনি প্রচুর কাঠ নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন দেশে চালান দিয়ে থাকেন।

হাবসী মিয়া আগে থেকেই দস্যু বনহুরের নামে আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন, এক্ষণে দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাবে ভড়কে গেছেন। সর্বদা তাঁর ভয়, না জানি কোন্ সময় দস্যু বনহুর তাঁর ওপর হামলা করে বসবে। তাই গোপনে তিনি মিঃ জাফরীর নিকটে সাহায্য চাইতে এসেছেন।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলার পর বিদায় গ্রহণ করলেন হাবসী মিয়া।

হাবসী মিয়া বিদায় গ্রহণ করার পর মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন মিঃ জাফরীর সামনে জেকে বসলেন।

মিঃ জাফরী বলেন—জানি আপনারা কেন এসেছেন। কিন্তু আপনারা জানেন কি ইনি কে?

মিঃ হারুন বললেন—ইনি কে সে পরিচয় তো আপনিই দিয়েছেন স্যার।

না, এটাই এর আসল পরিচয় নয় মিঃ হারুন।

তবে?

ইনি কে পরে জানতে পারবেন। তবে এঁকে ভালভাবে চিনে রেখেছেন তো?

হ্যাঁ স্যার, রেখেছি।

মিঃ জাফরী বলেন—ইনি কাঠের ব্যবসার নামে এখানে কোন চোরা কারবার শুরু করেছেন এবং এর সঙ্গেই যোগাযোগ রয়েছে দস্যু বনহুরের।

তাই নাকি স্যার? বললেন মিঃ হোসেন।

মিঃ জাফরী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন—লোকটা নিখুঁত অভিনয় করতে পারে।

মিঃ হারুন বললেন–লোকটা নাকি এদেশে অনেক দিন থেকে ব্যবসা করছে, সে এতদিন পুলিশের সাহায্য কামনা করল না, অথচ আজ....

এটাই তো দস্যু বনহুরের একটা চালাকি!

তাহলে হাবসী মিয়া দস্যু বনহুরের লোক?

এতে কোন সন্দেহ নে। ওর কথাবার্তায় সেই রকমই আমার সন্দেহ হয়েছে। তাহলে ওকে আমাদের এরেস্ট করা উচিত ছিল; বললেন— মিঃ হোসেন।

মিঃ হারুনই মিঃ হোসেনের কথার জবাব দিলেন, বললেন—যতক্ষণ উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ কাউকে এরেস্ট করা সম্ভব নয় মিঃ হোসেন।

এমন সময় হাবসী মিয়া হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করেন।

একসঙ্গে চমকে উঠলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন।

মিঃ হাবসী মাথার ক্যাপটা খুলে পুনরায় অভিবাদন জানিয়ে বললেন–স্যার, আমার সিগারেট কেসটা ফেলে গেছি।

সবাই একসঙ্গে তাকালেন টেবিলে। দেখতে পেলেন সোনালী রঙের একটা সিগারেট কেস পড়ে রয়েছে।

হাবসী মিয়া দ্রুত হস্তে সিগারেট কেসটা হাতে দিয়ে পুনরায় বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

❑

মনিরার কক্ষে ইতোমধ্যে আর চার-পাঁচজন যুবতী এসেছে। সবাই ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের তাতে সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে সুফিয়া নামের মেয়েটিকে না জানি কোথায় চালান করে দেয়া হয়েছে। সেদিনের কথা মনিরার মনে এখনও গভীরভাবে দাগ কেটে রয়েছে। হঠাৎ একদিন এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে বিরাট বপুধারিণী মহিলাটি এসে উপস্থিত হল—তাদের মধ্যে নিম্নস্বরে কিছু আলোচনা হলো। মনিরার হৃদয়ে তখন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছিল–কে জানে আজ কার ভাগ্যে কি আছে! মাড়োয়ারী লোকটি শেষ পর্যন্ত সুফিয়াকে আংগুল দিয়ে দেখাল।

তারপর সে কি করুণ দৃশ্য!

ঐ মহিলা সুফিয়াকে জোরপূর্বক মাড়োয়ারী লোকটির হাতে তুলে দিল।

সুফিয়া যখন তার সঙ্গে ধস্তধস্তি শুরু করল তখন দু'জন বলিষ্ঠ লোক এসে সুফিয়াকে শক্ত দড়ি দিয়ে মজবুত করে বাঁধলো, ঠিক মনিরাকে যেমন করে একদিন বেঁধেছিল।

সুফিয়ার সে কি কান্না, মনিরার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কি করবে সে। নিজেও যে সে অসহায়!

সুফিয়াকে বেঁধে নিয়ে যাবার পর মনিরা বুঝতে পারল বেশি টাকা দিতে লোকটা অসমর্থ হওয়ায় সে আজ বেঁচে গেল। কারণ সুফিয়ার দাম তার চেয়ে কম ছিল।

ইতোমধ্যে আরও দু'জন মেয়েকেও চালান দেয়া হয়েছে। মনিরা নিজের ভাগ্যের কথা অহরহ চিন্তা করে। কি দুর্ভাগ্য তার! সে বন্ধ কক্ষে একটি ছোট আসন সংগ্রহ করে নিয়েছে, তাতেই বসে সে সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা এবং গভীর রাতে খোদার কাছে প্রার্থনা করে—হে দয়াময়, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে নাও–আমার স্বামী, আমার পুত্র সব তুমি কেড়ে নিয়েছ তাতে দুঃখ নেই। আমাকে সর্বহারা করেছ তাতে আমি মর্মাহত নই, তুমি শুধু আমার ইজ্জত রক্ষা কর।

মনিরা বুদ্ধিমতী হয়েও আজ বুদ্ধিহীন। এখান থেকে পালাবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল, নানা রকম ফন্দি এঁটেছিল কিন্তু সব ব্যর্থ হয়েছে। এখন তাকে আর সেই পূর্বের কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়নি, অন্য একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মনিরার সেই কক্ষে এখন আরও কয়েকটি মেয়ে বন্দিনী রয়েছে।

মনিরা বুঝতে পেরেছে এই নরপিশাচী মহিলা শুধু বাঈজী নয়, সে-এক নারী ব্যবসায়ীও। জঘন্য এই মহিলার আচরণ। অতি সাংঘাতিক সে! মনিরা লক্ষ্য করেছে, এই নরপিশাচীর নিকটে বহু দেশের লোকের আমদানি হয়। ভদ্র সাধু সেজে সবাই এখানে আসা-যাওয়া করে থাকে। বাইরের লোক কিছুই টের পায় না। এই বিরাট বপুধারিণী মহিলা হেমাঙ্গিনী শুধু নারী-ব্যবসাই করে না, শিশু-ব্যবসাও করে।

দূর দূর দেশ থেকে তার অনুচরগণ ভদ্রঘরের সন্তানদের চুরি করে এখানে পাঠিয়ে দেয়। এখান থেকে ওদের চালান করা হয় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এবং দেশ হতে দেশান্তরে।

মনিরা শিক্ষিতা যুবতী, সব বুঝে সে। কিন্তু কি করবে, কোন উপায় নেই নিজেদের রক্ষা করার।

শয়তানী হেমাঙ্গিনী শৃগালিনীর ন্যায় ধূর্ত, মনিরা একটু বেশি বুদ্ধিমতী তাই তাকে আরও কড়া পাহারায় রেখেছে। কোন সময় যেন সে অন্য কোন যুবতীর সঙ্গে কথা বলতে না পারে সেজন্য কঙ্কাল ধরনের মহিলাটিকে নিয়োজিত রেখেছে। কঙ্কালিনী মহিলা তার কোটরাগত জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে সব সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাতে ঘুমিয়েও যেন শান্তি নেই মনিরার। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পায় মনিরা সেই কঙ্কালিনী মহিলা কক্ষের এক কোণে বসে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। ভাবে মনিরা সর্বনাশ, একি মানুষ না ভূত, কোন সময় ঘুম নেই তার চোখে!

দিনের পর দিন কেটে যায়, বদ্ধকক্ষে কঙ্কালিনীর দৃষ্টির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার উপক্রম হয় মনিরার।

ইতোমধ্যে আরও কয়েকজন লোক এসেছিল, তাকে দেখে পছন্দ করে দাম দর করেছিল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী তার দর চরমে বাড়িয়ে দিয়েছে, কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও কেউ মনিরাকে ক্রয় করতে সক্ষম হয়নি। মনিরা হাত তুলে খোদার নিকট প্রার্থনা করেছে–দয়াময়, তুমি এমনি করেই আমাকে বাঁচিয়ে নিও।

❑

এখানে মনিরা যখন খোদার নিকটে প্রার্থনা করে চলেছে, তখন বনহুর আর নূরী তাদের মনিকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে।

নূরী মনিকে নিয়ে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে আর গুন গুন করে গান গাইছে।

এমন সময় বনহুর পেছন থেকে এসে নূরীর চোখ দুটি টিপে ধরল।

নূরী দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে বনহুরের হাত স্পর্শ করে বললো—হুর!

বনহুর নূরীর চোখ ছেড়ে দিয়ে এবার মনির গালে মৃদু চাপ দিয়ে বলল—কার কোলে বসে দোল খাচ্ছ মনি?

মনি শব্দ করল–মা ম্মা-ম্মা.....

বনহুর অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে বলল—শুনলে নূরী?

নূরী হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ করলেও মুখখানা তার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। মনিকে বনহুরের কোলে তুলে দিয়ে বলল—নাও।

বনহুর হাত দু'খানা পেছনে রেখে মুখ নেড়ে বলল—উঁ হুঁ, ওকে আমি নেব না।

নিতেই হবে। নূরী মনিকে জোর করে দিতে গেল বনহুরের কোলে।

বনহুর পিছু হটতে শুরু করল।

কিন্তু নূরী নাছোড়বান্দা—নিতেই হবে আজ মনিকে।

অগত্যা বনহুর মনিকে কোলে নিয়ে আদর করছিল, নূরী তখন অবাক নয়নে তাকিয়েছিল উভয়ের মুখের দিকে—একি, হুর আর মনির মুখের মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে----এমন কেন হয়েছে? নূরী এটা অনেক দিন লক্ষ্য করেছে কিন্তু কিছু বলার সাহস হয়নি। এটা বলাও তার উচিত হবে না, কাজেই নিশ্চুপ থাকে নূরী।

বনহুর মনিকে আদর করছিল, এমন সময় রহমান এসে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—সর্দার; জরুরী খবর আছে।

বনহুর নূরীর কোলে মনিকে দিয়ে বলল—চল।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে গেল।

নূরী মনিকে নিয়ে দোলনায় শুইয়ে দিল।

❑

গোপন আলোচনাকক্ষে প্রবেশ করল বনহুর ও রহমান। বনহুর আসন গ্রহণ করে বলল—কি খবর রহমান?

সর্দার, আমাদের বিশ্বস্ত অনুচর কোরেশী একটা সন্ধান এনেছে। নারী হরণকারী এবং নারী ব্যবসায়ী একজন কুচক্রী নেতাকে সে আবিষ্কার করেছে। কোরেশীকে ডাকব?

হাঁ ডাক।

রহমান কলিংবেলে হাত রাখতেই এক বলিষ্ঠ লোক কক্ষে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানাল।

রহমান বলল–সর্দার, এর নামই কোরেশী।

বল তুমি কি সংবাদ সংগ্রহ করে এনছ?

বনহুর প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকাল কোরেশীর দিকে।

কোরেশী ওর হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করে বলল—সর্দার, একটি কাফ্রি লোক সেই নারীহরণকারী।

বনহুর বললো–সে-ই যে নারীহরণকারী, এ কথা তোমাকে কে বলল?

সর্দার, আপনার নির্দেশ মতই আমরা শহরের বিভিন্ন স্থানে গোপনে ছড়িয়ে রয়েছি। কেউ হোটেলে, কেউ ক্লাবে, কেউ পথে-ঘাটে-মাঠে, এমন কি পুলিশ অফিসেও আমরা রয়েছি।

পুলিশ অফিসে ?

হ্যাঁ সর্দার, আমাদের একজন পুলিশ অফিসে ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে কাজ করে।

আর তুমি?

আমি পুলিশ অফিসারের বাংলোয় কাজ করি।

বনহুর সোজা হয়ে বসল—মিঃ জাফরীর ওখানে?

হ্যাঁ, আমি সেখানে বাবুর্চির কাজ করি সর্দার।

বেশ! সেখান থেকে তুমি কি করে নারীহরণকারীর সন্ধান পেলে? প্রশ্ন করল বনহুর।

আজ সেখানে ঐ লোকটা এসেছিল।

কোন লোকটা?

সেই কাফ্রি ভদ্রলোক।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল–সেই যে নারীহরণকারী এবং নারী ব্যবসায়ী, এ কথা কেমন করে জানলে?

সর্দার, লোকটা চলে যাবার পর পুলিশ অফিসারদের মধ্যে যে আলোচনা হলো আমি লুকিয়ে থেকে সব শুনেছি। ঐ লোকটাই নাকি এ দেশে কাঠের ব্যবসার নামে নারীহরণ ব্যবসা চালাচ্ছে। কিন্তু সর্দার, পুলিশ সন্দেহ করছে ঐ কাফ্রি নাকি আপনার দলের লোক।

বনহুর হেসে বলল—তুমিও যেমন সন্দেহ করেছ ঠিক তেমনি মিথ্যা সন্দেহ করে চলেছে পুলিশ অফিসারগণ। কাফ্রি ভদ্রলোক যেমন আমার কোন অনুচর বা দলের লোক নয়, তেমনি সে নারীহরণকারী নাও হতে পারে। তবু তোমরা সেই কাফ্রি ভদ্রলোকে লক্ষ্য রাখবে।

কোরেশী বলল–আচ্ছা সর্দার। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

বনহুর এবার রহমানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল–রহমান, তাজকে প্রস্তুত কর।

তাজের পিঠে বনহুর এবং অন্য একটি অশ্বপৃষ্ঠে রহমান। দু'জনের শরীরেই সাধারণ সওদাগরী ড্রেস। বনপ্রান্তর ছাড়িয়ে ওরা দু'জন শহরে এসে পৌঁছল। কেউ দেখলে ওদের চিনতে পারবে না এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ হয়েছিল ওদের।

শহরে পৌঁছার পূর্বেই তাজ এবং দ্বিতীয় অশ্বটি বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বনহুর আর রহমান একটি ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসল।

রহমান ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল—কাঠের ব্যবসায়ী হাবসী মিয়ার বাড়ি চলো।

হাবসী মিয়াকে শহরের প্রায় সব যানবাহন চালকই জানে, কাজেই ড্রাইভার অতি সহজেই তাদের নিয়ে উপস্থিত হলো তার বাড়িতে।

বাড়ির অনতিদূরে হাবসী মিয়ার বিরাট কাঠের কারখানা। আফ্রিকার বন থেকে হাবসী মিয়া নানা রকমের কাঠ এনে এ দেশে কারবার করে থাকেন।

বাড়ি বলতে তার এমন সুন্দর বাড়ি কিছু নয়। কাঠ-কাঠরা দিয়ে থাকার মত খানিকটা জায়গা করে নিয়েছেন হাবসী মিয়া— সেখানেই তিনি বাস করেন তাঁর কয়েকজন কর্মী নিয়ে। তাঁর বেশির ভাগ কর্মী কাফ্রি।

এদেশের কারবার জমিয়ে হাবসী মিয়া বেশ মোটা টাকা করে ফেলেছেন। কোটিপতি বলা চলে। কিন্তু লোকটাকে দেখলে তেমন টাকাওয়ালা বলে মনে হয় না। ঢিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরেন। মাথায় একটা সাদা টুপি এবং পায়ে কুমীরের চামড়ার জুতা। অদ্ভুত চেহারা এই হাবসী মিয়ার।

টাকা পয়সা ছাড়া হাবসী মিয়া কিছুই বুঝেন না। কোন ফাংশন বা পার্টিতে তাকে কোনদিন দেখা যায়নি। লোকসমাজে কেউ তাঁকে দেখতে পায় না, লোকটা সদা কাজ আর কাজ নিয়েই থাকেন। এমন কি হাবসী মিয়া এত টাকা-পয়সাওয়ালা মানুষ হয়েও একটা চটের বিছানায় দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমান।

কোন লোকের সঙ্গেই তেমন তাঁর পরিচয় নেই। শহরের যার বিশেষ করে কাঠের প্রয়োজন তারই শুধু পরিচয় এই অদ্ভুত ভদ্র লোকটির সঙ্গে।

সওদাগর দু'জনকে দেখতে পেয়ে হাবসী মিয়া সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তার বসবার কাঠের ঘরখানায় নিয়ে বসালেন। মোটা পুরু শালকাঠের তক্তা দিয়ে ঘরখানা তৈরি। ঘরের খুঁটিগুলো মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি করা হয়েছে। মেঝেতে এবং আশেপাশে বিচ্ছিন্নভাবে এলোমেলো কাঠের টুকরা ছড়ানো।

বনহুর আর রহমান সওদাগরের বেশে হাবসী মিয়ার বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করল।

হাবসী মিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন— স্যার, আপনাদের কি ধরনের কাঠ বা তক্তার প্রয়োজন?

রহমান বলল— একটা বজরা তৈরির অর্ডার দেব।

হাবসী মিয়া খুশি হলেন— বজরা! আপনারা যে ধরনের বজরার অর্ডার দেবেন আমরা অতি অল্প সময়ে মজবুত করে তৈরি করে দিতে পারব।

এবার বনহুর বলল— আপনার কাছে রুচিমত জিনিস পাব বলেই আমরা অনেক দূরে থেকে এসেছি।

নিশ্চয়ই পাবেন, অবশ্যই পাবেন। আমার কাছে কয়েকটা বজরার ক্যাটালগ আছে, চলুন দেখবেন।

চলুন। বনহুর উঠে দাঁড়াল।

রহমানও বনহুরকে অনুসরণ করল।

হাবসী মিয়া বনহুর এবং রহমানকে তার বজরার ক্যাটালগগুলো দেখালেন।

বনহুর ক্যাটালগে একটা বজরা দেখিয়ে সেই মত একটি বজরা তৈরি করার জন্য অর্ডার দিল।

হাবসী মিয়া খুশিতে আত্মহারা হলেন। যদিও তিনি দৈনিক বহু কাজের এবং কাঠ ও তক্তার অর্ডার পেয়ে থাকেন তবু এমন একটা অর্ডার পাওয়া কম কথা নয়! অনেকগুলো টাকা পেয়ে তার আনন্দের সীমা রইল না।

সওদাগরবেশি বনহুর এবং রহমান এক সময় বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

ঠিক সেই সময় একটা জীপগাড়ি এসে হাবসী মিয়ার কারখানার সামনে থামল।

বনহুর লক্ষ্য করলো দু'জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক জিপগাড়ি থেকে নেমে কারখানায় প্রবেশ করলেন। একজনের চোখে কাল চশমা এবং মুখে দাড়ি রয়েছে। অন্যজনের মুখেও একমুখ পাকা দাড়ি আর গোঁফ। বনহুর আর রহমান আরও অক্ষ্য করল, হাবসী মিয়া এদের দু'জনকেও সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

বনহুর এবার ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়বার আদেশ দিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে বলল বনহুর— রহমান, যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক দু'টি এই মুহূর্তে জীপ থেকে নেমে হাবসী মিয়ার কারখানায় প্রবেশ করল তাদের চিনতে পেরেছ?

না সর্দার, ওদের চিনতে পারলাম না।

আমাদের অতি পরিচিত লোক ওরা।

কিন্তু আমি কোথাও ওদের দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো?

নিখুঁত ছদ্মবেশ রয়েছে ওঁদের। কিন্তু আমার চোখে ধুলো দেয়া ওদের কাজ না। তাঁদের একজন পুলিশ অফিসার মিঃ হারুন, অন্যজন শঙ্কর রাও, পুলিশ ডিটেকটিভ।

সর্দার, ওরা কেন?

আমরা যে কারণে হাবসী মিয়ার ওখানে গিয়েছিলাম ওরাও ঠিক সে কারণে বুঝেছ?

হাবসী মিয়াকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হলো সর্দার?

খুব ভাল লোক।

তাহলে সে এ নারীহরণ ব্যাপারে জড়িত নয়?

না, হাবসী মিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ। নারীহরণ বা ছেলেমেয়ে চুরি এর কোনটাই সে করে না।

সর্দার, তাহলে অতগুলো টাকা---

নষ্ট হলো, এই তো?

হ্যাঁ সর্দার, অযথা বজরার বায়না বাবদ এতগুলো টাকা না দিলেও চলতো না কি?

চলতো কিন্তু এতদূর তলিয়ে তাকে বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া বজরার তো প্রয়োজনই রয়েছে একটা নিয়ে নেয়া যাবে।

রহমান কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল— পুলিশের লোকও তাহলে হাবসী মিয়াকে সন্দেহ করেছে?

হ্যাঁ, রহমান তারা শুধু হাবসী মিয়াকে নারীহরণকারী বলেই সন্দেহ করেছে।

কথাগুলো বেশ নীচুস্বরে হচ্ছিল, যাতে ড্রাইভার শুনতে না পায়।

বনহুর আর রহমান যখন গাড়ি ত্যাগ করলো তখন তারা ড্রাইভারকে অনেকগুলো টাকা বখশিস দিল।

ড্রাইভার অবাক কণ্ঠে বলল— স্যার, এত টাকা দিচ্ছেন কেন?

রহমান হেসে বলল— তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

ড্রাইভার বলল—আপনারা কে? নিশ্চয়ই কোন মহান ব্যক্তি আপনারা?

এবার বনহুর কথা বলল— ঠিক তার উল্টা—দস্যু বনহুর!

ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলল ড্রাইভার— দস্যু বনহুর।

হাঁ, যাও।

ড্রাইভার জানে, দস্যু বনহুর লোকের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নেয়, সে আবার টাকা দেয়, এত দয়ালু দস্যু বনহুর।

ড্রাইভার একবার হাতের টাকাগুলো, একবার দস্যু বনহুরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

বনহুর আর রহমান একটু হেসে তাদের গন্তব্যপথে পা বাড়াল।

বনহুর আর রহমান দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হতেই ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে ড্রাইভারের বুকের মধ্যে। দস্যু বনহুরকে সে স্বচক্ষে দেখেছে, তার গাড়িতেই দস্যু বনহুর চেপেছিল, এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা আর কি আছে? কোথায় কাকে বলবে, কার কাছে বললে সে তৃপ্তি পাবে ভাবতে লাগল। মনে পড়ল কিছুদিন পূর্বের সেই সরকারি ঘোষণার কথা—দস্যু বনহুরকে যে মৃত বা জীবিত পাকড়াও করে আনতে পারবে তাকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

ড্রাইভারের দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, তখনই গাড়ি নিয়ে ছুটলো পুলিশ অফিসের দিকে।

সে পুলিশ অফিসে গিয়ে বলল— হুজুর, একটা খবর আছে, দস্যু বনহুরকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং আমার গাড়িতে সে চেপেছিল।

ড্রাইভারের কথা শুনে পুলিশের লোকের সন্দেহ হলো। নিশ্চয়ই এ দস্যু বনহুরের দলের কোন লোক। পুলিশ ওকে গ্রেফতার করে ফেলল এবং তল্লাশি করে অনেক টাকা উদ্ধার করল ওর জামার পকেট থেকে।

হাজতে বন্দী হয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল ড্রাইভার। হায়, কেন সে ভাল মনে করে পুলিশ অফিসে কথাটা জানাতে গিয়েছিল, শেষে কিনা টাকাগুলোও গেল, হাজতেও আসতে হলো।

এবার ড্রাইভার বুঝতে পারল কেউ উপকার করলে তার অপকারের চেষ্টা করা মহাপাপ। ডুকরে কাঁদতে লাগল সে।

❑

দাড়ি-গোঁফভরা মুখ, মাথায় এক রাশ এলোমেলো জটধরা চুল। চোখ দুটো কোটরাগত। দেহ কঙ্কালসার। পৃথিবীর বুকে এসে দাঁড়াল কায়েস। প্রাণভরে নিশ্বাস নিল। কতদিন পর সে দুনিয়ার আলো বাতাস গ্রহণ করল।

টলতে টলতে পথ চলছে।

পাশ কেটে চলে যাচ্ছে কত যানবাহন, কত লোকজন।

কেউ তাকাচ্ছে, কেউ তাকাচ্ছে না। কেউ বা পাগল ভেবে ঢিল ছুড়ে মারছে। শরীরে কাপড় নেই বললেই চলে— এক টুকরা ময়লা ন্যাকড়া নেংটির মত করে পরা রয়েছে। একদিন এই কায়েস যে একজন মস্ত বলিষ্ঠ পুরুষ ছিল, তার শরীরে ছিল অসীম বল, আজ তাকে দেখলে কেউ তা বিশ্বাসই করবে না।

কায়েস ঝিন্দ শহরের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। ক্ষুধা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর সে, এতটুকু খাদ্য আর পানির নিতান্ত দরকার তার। একটা কলতলায় এসে দাঁড়াল।

কতগুলো নারীপুরুষ কলসী এবং মশকে করে পানি ভরছে। কায়েস কতদিন পরিষ্কার পানি পান করেনি। লোলুপ দৃষ্টিতে পানির দিকে তাকিয়ে রইলো। এক তরুণী বলল— এই পাগলা, পানি খাবি?

কায়েসের গলা দিয়ে কথা বের হলো না, মাথা দোলাল সে— খাবে।

তরুণী একটা মাটির পাত্রে কিছুটা পানি এনে কায়েসের সামনে রাখল, বলল— খা।

কায়েস এক নিঃশ্বাসে পানিটুকু পান করে এটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। এতক্ষণে যেন কায়েস পুর্নজন্ম লাভ করল। আবার পথ চলতে শুরু করল সে।

কায়েস চলছে আর ভাবছে এখন কোথায় যাবে, কি করবে। ঝিন্দ শহরে সে তেমন করে কারও সঙ্গে পরিচিত নয়, আর যা একটু পরিচয় কারও কারও সঙ্গে ছিল তারাও চলে গেছে এত দিনে নিশ্চয়ই। নতুন করে পরিচয় দিলে এ অবস্থায় তাকে কেউ চিনতেই পারবে না। আজ আবার নতুন করে মনে পড়তে লাগল সর্দারের কথা। দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এলো। সর্দারকে তারা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। মনে পড়লো সর্দারপত্নী মনিরার কথা, তাকে খুঁজতেই তো বেরিয়ে ছিল সে, তারপর এই অবস্থা। তিনি এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কে জানে। তাঁর গর্ভে ছিল সর্দারের সন্তান। একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন দোলা দিয়ে গেল কায়েসের মনে। মুহূর্তের জন্য কায়েস ভুলে গেল তার ক্ষুধাকাতর অবস্থার কথা। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে। নিশ্চয়ই মনিবপত্নীর সন্তান জন্মেছে। তিনি যেখানেই থাকুন, সন্তান প্রসব করেছেন তা ঠিক। কিন্তু মেয়ে না ছেলে জন্মেছে কে জানে। কায়েস নিজ মনেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল ওরা যেখানেই থাক আমি খুঁজে বের করবই। আবার চলতে লাগল কায়েস।

পথে পথে ঘুরে ঘুরে দিন কাটতে লাগল কায়েসের। দয়া করে কেউ দু'একটা পয়সা ছুড়ে দেয় তার দিকে, তাই দিয়ে কিছু কিনে খায় সে। ফুটপাথের ধারে রাত কাটে আর, দিনের বেলায় কাটে পথে পথে। এমনিভাবে দিন যায়, সপ্তাহ আসে, সপ্তাহ গিয়ে মাস হয়ে এলো। হতাশায় আর ক্লান্তিতে ভরে উঠল কায়েসের মন। কই, এতদিনেও তো তার মনিবপত্নী মনিরা ও তার সন্তানের সন্ধান পেল না। তবে কি তারা বেঁচে নেই?

যেখানেই কোন যুবতী বা নারী দেখতো কায়েস সেখানে গিয়েই দাঁড়াত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকত লক্ষ্য করত তার সর্দারের পত্নীর মত দেখতে কিনা।

এমনি লুকিয়ে লুকিয়ে যুবতীদের দেখতে গিয়ে বহুদিন কায়েসকে হতে হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত, শয়তান-বদমাস নামে অপবাদ নিতে হয়েছে তাকে। তবু দুঃখ নেই তার এতটুকু, মনের যত ব্যথা কষ্ট মুছে ফেলে সে আবার ছুটে যেত কোন যুবতী বা মহিলা দেখলেই। হয়তো দু'চার ঘা-চড়-থাপ্পড় খেতে হতো তাকে।

কায়েস যখন মনিবপত্নী এবং তার সন্তানের সন্ধানে ঝিন্দ শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন সেই মনিবপত্নী এক নারী ব্যবসায়ীর চোরাকক্ষে বন্দিনী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। আর তার সন্তান দিন দিন শশীকলার মতই বেড়ে উঠছে নূরীর কোলে।

❑

আজকাল আবার বনহুর তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। কাজ আর কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে। শহরে আবার দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য। শুধু একটি শহর বা কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই বনহুর তার দস্যুবৃত্তি সীমাবদ্ধ রাখল না, সব জায়গায়ই চলল তার অভিযান। আবার সে মেতে উঠল নব উদ্যমে।

নগরবাসীর মনে আবার ত্রাহি ত্রাহি ভাব জাগল। পুলিশমহল ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। পুলিশদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও এখানে সেখানে চললো লুটতরাজ।

শহরের সবচেয়ে বড় ব্যাংকে হানা দিয়ে দস্যু বনহুর এক লাখ টাকা নিয়ে উধাও হল। পরদিনই পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের বাড়িতে হানা দিয়ে বহু অলঙ্কার ও নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে যায় বনহুর। এবার সে পূর্বের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

মিঃ আহমদের বাড়িতে ডাকাতি হওয়ায়, পুলিশমহল পর্যন্ত ঘাবড়ে যায়। নানাভাবে, নানা কৌশলে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য তৎপর হয় সবাই।

শহরের এবং গ্রামাঞ্চলের বিশিষ্ট লোকজন সবাই নিজেদের রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

দরজায় বন্দুকধারী পাহারাদার। বাড়ির আশেপাশে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেও কেউ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে না। বিছানায় শুয়ে সদা ভয়কম্পিত হৃদয়ে সময় কাটায়–কবে কখন না জানি দস্যু বনহুর এসে হাজির হবে।

সকলের মনেই দস্যু বনহুরের নামে আতঙ্ক। নারীহরণ, শিশুহরণ, অর্থহরণ সবই নাকি দস্যু বনহুরের কাজ।

বনহুর অজস্র টাকা লুট করে আবার তার ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলল। আবার সে ইচ্ছামত অর্থ ছড়িয়ে দিতে লাগল দীনহীন জনগণের মধ্যে। ইচ্ছমত নষ্টও করতে লাগল সে ঐ সব লুটতরাজের মালামাল।

নূরী অবাক হয়ে বলল, একদিন সে— হুর, তুমি আবার এমন ভাবে ক্ষেপে উঠলে কেন? আমার কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল বনহুর— কিসের আশঙ্কা নূরী?

সাতবার জয়ী হয়ে একবার যদি পরাজিত হও!

বনহুর নূরীর গালে মৃদু টোকা দিয়ে বলল— তোমার মনে এ দুর্বলতা শোভা পায় না নূরী। তুমি কি চাও, আমি পরাজিত হই?

ছিঃ এ কথা তুমি বলতে পারলে হুর! তোমার পরাজয় আমি কামনা করতে পারি! অভিমানে ভরে উঠল নূরীর মুখ।

বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলল— নূরী, তুমি রাগ কর না, আমি যে তাহলে দিশেহারা হয়ে পড়ব।

কিন্তু তুমি কেন আবার এভাবে নিজেকে মাতিয়ে তুললে হুর? বেশ তো শান্ত হয়ে এসেছিলে?

বনহুর নূরীকে ছেড়ে দিয়ে বলল—নূরী, তুমি কি চাও, আমি নির্জীবের মত নীরব হয়ে পড়ি?

না, তা চাই না, কিন্তু----

হেসে উঠল বনহুর—নূরী, সিংহশাবক কোনদিন চুপ থাকতে পারে না। রক্তের পিপাসা তাকে চুপ থাকতে দেয় না—

তুমি কি উম্মাদ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নূরী যা বলো তাই।

এত অর্থ তুমি কি করবে হুর?

অর্থ? যে প্রশ্ন তুমি করেছ নূরী তা অতি সত্য। কিন্তু জানতো, অর্থ আমি নিজের জন্য জমা রাখি না। আমার লাখ লাখ অসহায় দীনহীন অভাগা ভাইবোনদের মাঝে বিলিয়ে দেই।

জানি হুর, সব জানি, তবু প্রশ্ন করি।

না নূরী, এ প্রশ্ন তুমি আর আমাকে কর না।

❑

কায়েস অনেক সন্ধান করেও যখন মনিরা ও তার সন্তানের কোন খোঁজ পেল না তখন হতাশায় তার মন ভেঙ্গে পড়ল। এভাবে পথে পথে ঘুরে আর তার কোন লাভ হবে না। মনে পড়লো রহমানের কথা, মনে পড়লো অন্যান্য সঙ্গীর কথা। তার কান্দাই বনের আস্তানায় ফিরে যাওয়া উচিত। সেখানে রহমান আছে, আরও দলবল আছে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার সে ঝিন্দ শহরে আসবে। ঝিন্দের প্রতিটি বাড়ি সে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার সর্দারপত্নী মনিরাকে? যদি তারা বেঁচে থাকে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন খুঁজে বের করবই।

কায়েস এবার ফিরে চলল কান্দাই আস্তানায়।

পয়সা ছিল না তার, ভিখারীর বেশে একদিন কান্দাই এসে পৌছল।

অতি কষ্টে একদিন সে নিজেদের আস্তানায় আসতেও সক্ষম হল। কিন্তু তার চেহারা এমনভাবে বদলে গেছে যে, তাকে দেখে তার অতি আপনজনও চিনতে পারবে না।

কায়েস যখন তাদের আস্তানায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিল তখন তাকে বনহুরের কয়েকজন অনুচর পাকড়াও করে ফেলল।

গুপ্তচর ভেবে তাকে ওরা মজবুত করে বেঁধে নিয়ে এলো বনহুরের দরবারে।

বনহুর তখন সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট। সামনে দণ্ডায়মান তার অনুচরগণ। দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারা। নতুন কোন জায়গায় হানা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল দস্যু বনহুর।

রহমান তার দক্ষিণ পাশে দণ্ডায়মান।

প্রত্যেকটা অনুচরের হাতে সুতীক্ষ্ণধার বর্শা, বল্লম ও রাইফেল।

এমন সময় দরবারকক্ষে প্রবেশ করল বনহুরের দু'জন অনুচর। কুর্ণিশ জানিয়ে বলল— সর্দার একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—গুপ্তচর?

হ্যাঁ সর্দার। লোকটা আমাদের আস্তানায় প্রবেশের চেষ্টা করছিল।

রহমান বলে উঠল—এত সাহস তার!

বনহুর বলল— গুপ্তচর মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না রহমান। প্রাণ দিয়ে ওর সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে।

রহমান বলে উঠল—নিশ্চয়ই পুলিশের গুপ্তচর হবে।

বনহুর বলল—নিয়ে এস তাকে।

অনুচরদ্বয় চলে গেল, একটু পরে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার কায়েসকে পিছমোড়া করে বেঁধে দরবারকক্ষে নিয়ে এলো।

কায়েস দরবারকক্ষে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বনি করে উঠল- সর্দার! দু'চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেল ভুলে গেল তার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। ছুটে এগিয়ে যেতে গেল সে, অমনি ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। কায়েস বুক দিয়ে এগুতে লাগল। তার সর্দার জীবিত রয়েছে, এ যে সে কল্পনাও করতে পারেনি। আনন্দে বুক তার স্ফীত হয়ে উঠছে।

কায়েসের অদ্ভুত আচরণে বনহুর এবং তার অনুচরগণ আশ্চর্য হলো। রহমান বলল— একি ব্যাপার সর্দার?

কায়েস তখনও বনহুরের আসনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে।

বনহুর তার একজন অনুচরকে আদেশ করল ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করা হলো।

কায়েস বন্ধনমুক্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তার দৃষ্টি সর্বক্ষণ বনহুরের দিকে রয়েছে। কায়েস যেন হারানো ধন ফিরে পেয়েছে। লম্বা চুল, দাঁড়ি-গোফে ভরা মুখখানা তার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রহমান বলল— সর্দার, লোকটাকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।

কায়েস ততক্ষণে বনহুরের আসনের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

দু'জন অনুচর ওকে ধরে ফেলল— এখানে দাঁড়াও।

কায়েস ক্ষীণকণ্ঠে বলল— না, আমাকে সর্দারের কাছে যেতে দাও। ছেড়ে দাও তোমরা আমাকে, যেতে দাও।

বনহুর এবার বলল—আসতে দাও ওকে।

এবার আর কেউ তাকে বাধা দিল না, সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো বনহুরের আসনের সম্মুখে।

রহমানের মুখমণ্ডল রাগে গম্ভীর হয়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই লোকটা কোন অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে। তাদের সর্দারকে হত্যা করে নিজে মৃত্যুবরণ করতেও ভীত নয়। রহমান নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কায়েস বনহুরের নিকটবর্তী হয়ে পুনরায় আনন্দভরা গলায় বলে উঠল— সর্দার, আপনি জীবিত।

বনহুর বলল— কে তুমি?

কায়েস ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল— আমাকে চিনতে পারছেন না সর্দার? আমি ---আমি কায়েস--

তুমি কায়েস! সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো। মনিরার নিরুদ্দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কায়েসের। তার চক্রান্তেই হয়তো মনিরা বিপথে গিয়েছিল। তাই বনহুর ভুলেও কোনোদিন কায়েসের নাম মুখে আনেনি। রাগে ক্ষোভে অভিমানে বনহুর দগ্ধীভূত হয়েছে তবু কোনদিন মনিরা বা কায়েসের সন্ধান নেয়নি।

রহমান যদি কোনদিন বলেছে মনিরা বা কায়েসের সম্বন্ধে কোন কথা, তাহলে বনহুর ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে। কোন অনুচর ভয়ে কোনদিন কায়েসের নাম মুখে আনার সাহস পায়নি, আজ সেই কায়েস স্বয়ং দস্যু বনহুরের সামনে হাজির!

বনহুর গর্জন করে উঠল— বদমাশ কোথা থেকে এলি তুই! জানিস তোর জন্য মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া রয়েছে?

কায়েসের মুখমণ্ডল বিষণ্ন হলো, ব্যথাকাতর কণ্ঠে বলল— সর্দার, আমার অপরাধ?

বনহুর আসন থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল— রহমান, ওকে আমার বিশ্রামকক্ষে হাজির করো। কথা শেষ করে বেরিয়ে গেল বনহুর।

দরবারকক্ষে একবার সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। রহমান বলল— একে আমার সঙ্গে নিয়ে এসো।

দু'জন অনুচর পুনরায় কায়েসের হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে চলল।

রহমান বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে দেখল বনহুর ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছে।

কায়েস এবং দু'জন অনুচরসহ রহমান প্রবেশ করতেই বনহুর থমকে দাঁড়াল।

রহমান অনুচরদ্বয়কে বেরিয়ে যাবার জন্য ইংগিত করল।

কায়েস এবং রহমান দাঁড়িয়ে রইলো শুধু। কায়েসের চোখে মুখে এখনও আনন্দের ছাপ, যদিও তার হাত দু'খানা পুনরায় কঠিন ভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বলল— জান তোমাকে এখনই হত্যা করা হবে?

আমি কি অপরাধ করেছি মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে তা জানতে চাই। তারও পূর্বে আর একটি কথা আমাকে বলুন, আমাদের বৌ-রাণী কোথায়; তার সন্তান কোথায়?

প্রচন্ড আক্রোশে হুঙ্কার ছাড়ে বনহুর— চুপ কর বদমাশ। ও নাম আর আমার সামনে উচ্চারণ করিস না। পাপিষ্ঠা --রাগে ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে বনহুর। দু'চোখে যেন আগুন ঝরে পড়ে।

রহমান নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো, বনহুরের দিকে তাকাবার সাহস হলো না তার।

কায়েস যখন বলে উঠছিল— বৌরাণী কোথায়, তার সন্তান কোথায়, তখন বিস্ময়ভরা চোখে রহমান তাকিয়ে দেখছিল একবার কায়েসের মুখে, একবার বনহুরের মুখে। বৌরাণী হারিয়ে গেছে, কার সঙ্গে গেছে, কোথায় গেছে এসবের কিছুই জানে না সে। তার আবার সন্তান--- এসব কি শুনছে রহমান! এতদিনে রহমান বুঝতে পারলো, তার সর্দারের মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা নীরবে লুকিয়ে আছে; যা আর কেউ জানে না। এবার বুঝতে পারলো সে আর একমাত্র জানে কায়েস। রহমান নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। মনের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যাচ্ছে---- তবে কি তাদের প্রিয় বৌরাণী------ঐ রকম কিছু ঘটেছে যা সর্দার আজও কারও কাছে প্রকাশ করেনি বা করতে পারেনি। এমন কি তাকেও কোনদিন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেনি।

রহমান পুনরায় তাকাল কায়েসের দিকে।

কায়েস তখনও উৎফুল্ল মুখে বনহুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

বনহুর অধর দংশন করে বলল— শয়তান, বল— মনিরা কি করে ঐ পাপিষ্ঠ মুরাদের হাতে গিয়ে পড়ল।

অবাক হয়ে তাকাল কায়েস, বলল— বৌরাণী তবে নরাধম মুরাদের কবলে পড়েছিল? আপনি ঠিক জানেন সর্দার?

কেন, তুই জানিস না! নেকামি করছিস?

না সর্দার, আমি শপথ করে বলছি বৌরাণী কোথায় গেছে, কে তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, এসবের কিছু জানি না।

আমার কাছে মিথ্যা কথা! জানিস মিথ্যা কথার শাস্তি কি?

জানি সর্দার—আমি যা বলছি তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। সর্দার, আজ আমার এ অবস্থা কেন? আজ আমি মৃত্যুপথের যাত্রী--শুধু বৌরাণীর জন্যই আজ আমার এ অবস্থা--তার সন্ধানে গিয়েই আমি বন্দী হয়েছিলাম--

বনহুর এতক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল কায়েসের মুখে, একটা ব্যাকুল আগ্রহ ফুটে উঠল তার চোখে।

কায়েস বলে চলেছে। বনহুর নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে সব কথা একটি পর একটি বলছে— সর্দার, আপনাকে নদীবক্ষে ত্যাগ করে যখন আমরা ফিরে গেলাম তখন বৌরাণীকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যায় না, আত্মবিসর্জন দেবেন সিন্ধি নদী বক্ষে। অতি কষ্টে নানা উপায়ে তাকে এক রকম বন্দিনী অবস্থায় নিতে হলো। কিন্তু ঝিন্দ শহরে পৌছে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল। সর্দার কি বলবো, আপনার শোকে তিনি পাগলিনী প্রায় হয়ে পড়লেন। আহার নিদ্রা কিছুই ছিল না তার। অহরহ শুধু নীরবে বসে কাঁদতেন। এক সময় তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সব সময় মাথাধরা গা বমি বমি করত—কিছু খেলে অমনি বমি করতেন। আমি তাঁর এমন অবস্থা দেখে চিন্তিত হলাম--

বনহুর গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে কায়েসের মুখের দিকে। তার দু'চোখে ফুটে উঠেছে রাজ্যের আকুলতা।

রহমানের অবস্থাও তাই, নিশ্চুপ হয়ে শুনছে সে ওর কথা। কায়েস বলে চলেছে ----ডাক্তার ডাকলাম, ডাক্তার বৌরাণীকে পরীক্ষা করে বলল---- বৌরাণীর গর্ভে সন্তান আছে। সর্দার সেকি আনন্দ। ভুলে গেলাম আপনাকে হারানোর ব্যথা। বৌরাণীর গর্ভে আমাদের সর্দারের সন্তান—এ যে কত খুশির কথা -- বলতে বলতে কায়েসের চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বলেই চলেছে কায়েস— এরপর থেকে আমি বৌরাণীকে সব সময় ভালভাবে দেখাশোনা করতে লাগলাম। প্রতীক্ষা করতে লাগলাম সেই নতুন অতিথির যে আমাদের বৌরাণীর গর্ভে বিরাজ করছে— কিন্তু সে আশা

আমার সফল হলো না সর্দার— আমি ক'দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম কিন্তু ফিরে এসে দেখি সব শূন্য—বৌরাণী নেই। বাড়ির কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। কিছুদিন পূর্বের একটি ঘটনার জন্য আমার মনে আশংকা হলো। একদিন একটি সিনেমা হলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৌরাণীকে দেখে মেয়ে বলে আঁকড়ে ধরল এবং এমন সব কথাবার্তা বলতে লাগল যা আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। সর্দার, বৌরাণীকে আমি জোর করে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম দিনরাত বসে বসে কাঁদাকাটা করেন বাইরে বেরুলে মনটা একটু ভাল হবে। আমার মনে হয়, সেই বৃদ্ধবেশি কোন শয়তান তাকে নিজের ব্যবহার দ্বারা মুগ্ধ করে--

এতক্ষণে বনহুর কথা বলল— হ্যাঁ সে বৃদ্ধ অন্য কেউ নয়, নরাধম পাষণ্ড শয়তান মুরাদ।

সর্দার, বৌরাণী তবে মুরাদের হাতে বন্দী?

এক সময় ছিল আজ আর নেই। আমি মুরাদকে হত্যা করেছি—

বৌরাণী—বৌরাণী কোথায় তবে সর্দার?

বনহুর দৃষ্টি নত করে নিল, তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বলল—জানি না।

কায়েস আর্তনাদ করে উঠল— বৌরাণী এবং তার সন্তান— কারও কথাই আপনি জানেন না সর্দার?

না কায়েস, জানি না তারা এখন কোথায়।

সর্দার, বৌরাণীর কি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করল কায়েস।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল— তাও জানি না।

এবার রহমান বলে উঠল— সে কি সর্দার, বৌরাণীর কি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তাও জানেন না? তার সঙ্গে নাকি আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছিল?

হ্যাঁ ঘটেছিল, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। আমি দূর থেকে শুধু তার সন্তানকে দেখেছিলাম।

কায়েস অস্ফুট শব্দ করে উঠলো— নিজের সন্তানকে আপনি দেখেও দেখেননি!

কায়েস, আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম। শয়তান মুরাদ মরার সময় আমার মনে বিষবাণ নিক্ষেপ করে গিয়েছিল, তাই আমি মনিরাকে ভুল

বুঝেছিলাম কায়েস, তাকে ভুল বুঝেছিলাম------বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের কণ্ঠ।

রহমান এবং কায়েস বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। বনহুরের চোখে মুখে একটা অসহ্য বেদনার ছাপ ফুটে উঠল। দক্ষিণ বাহু দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল বনহুর।

এতদিনে রহমানের কাছে সর্দারের মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। কেন সর্দার ফিরে আসার পর এমন মৌন হয়ে পড়েছিল। সব সময় গভীরভাবে কি চিন্তা করত, হঠাৎ আবার কেনই বা এমন ভীষণভাবে ক্ষেপে উঠেছে। পূর্বের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে সর্দার এখন— সব আজ পরিষ্কার হয়ে যায় রহমানের কাছে। শান্তকণ্ঠে বলল রহমান— সর্দার, বৌ রাণী এখন কোথায় আছে বলতে পারেন?

বনহুর চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। ব্যথাকরুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো রহমানের মুখে, বলল— জানি না। তবে যতদূর সম্ভব সে এখনও ঝিন্দ শহরেই আছে।

কোথায় আছে, কেমন আছে তাও জানেন না? কায়েস প্রায় কেঁদে ফেলল।

রহমান বলল— সর্দার, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, আজই আমরা ঝিন্দ শহর অভিমুখে রওয়ানা দেব। না জানি বৌরাণী কোথায় আছেন, কেমন আছেন। বিশেষ করে তিনি মেয়েলোক। কোলে তাঁর কচি সন্তান।

হ্যাঁ রহমান, তাই কর, তাই কর-- কিন্তু সে বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

❑

বনহুর নিজের কক্ষে বসে গভীরভাবে মনিরার কথা চিন্তা করছিল। কি অন্যায় সে করেছে মনিরার ওপর! তাকে পেয়েও হারিয়েছে, একটা মিথ্যা সন্দেহে তার প্রতি কি নির্মম আচরণ করেছে। কি অন্যায়ই না সে করেছে। মনিরা তার এ কঠিন ব্যবহার কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না----

অভিমানিনী মনিরা হয়তো আত্মহত্যা করেছে। না না, তা পারবে না— কোলে যে কচি শিশু— তার স্বামীর সন্তান। মিথ্যা কলঙ্কের ভয়ে এত বড় সত্যকে সে নষ্ট করতে পারে না। কিন্তু ঝিন্দ শহর তার একেবারেই অপরিচিত ,কেউ তাকে চেনে না, জানে না। সেও কাউকে জানে না, শোনে না; কোন জায়গা চেনে না। এখন ঝিন্দ শহরে কোথায় তাকে খুঁজবে, কোথায় পাবে—

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, কক্ষে প্রবেশ করল নূরী, কোলে তার মনি।

নূরী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলল—দেখ হুর, মনি কেমন হাসছে।

বনহুর অন্যমনস্কভাবে তাকালো মনির দিকে, তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আর একটি কচি মুখ। আনমনা হয়ে গেল বনহুর।

নূরী অভিমানভরা কণ্ঠে বলল—কি হলো আজ আবার তোমার?

ভ্রুকুঞ্চিত করে একটু হাসল বনহুর— কেন?

মনে হচ্ছে কিছু যেন হয়েছে।

তুমি দেখছি গণনা জান।

সত্যি হয়েছে কিনা বল?

হয়েছে, আমাকে আজই ঝিন্দে যেতে হবে।

সিন্ধি নদীর ওপারে?

হ্যাঁ, নূরী, সিন্ধি নদীর ওপারে— যাক, চলো একটু গল্প করা যাক।

মনিকে আজ তুমি আদর করছ না কেন?

মনির গালে মৃদু টোকা দিয়ে বলল বনহুর— এই তো করছি।

আবার বনহুর আর নূরী মেতে উঠল মনিকে নিয়ে।

❑

ঝিন্দ শহরে যাবার জন্য নূরী বনহুরকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিল। একজন ভীল সর্দারের বেশে সজ্জিত হলো বনহুর।

রহমানও বনহুরের মতই ভীলের সাজে সজ্জিত হলো। স্থলপথেই বনহুর এবং রহমান ঝিন্দ রওয়ানা দিল। অবশ্য একখানা বজরা জলপথে চলল তাদের জিনিসপত্র ও অন্যান্য অনুচর নিয়ে।

ভীল সর্দারের বেশে সজ্জিত হয়ে তাজের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বনহুর আর রহমান।

নূরী এসে দাঁড়াল তার পাশে, কোলে মনি।

আজ হঠাৎ কেন যেন বনহুরের দৃষ্টি মনির মুখে পড়তেই হৃদয়ে একটা আলোড়ন অনুভব করলো, তাজের পিঠে চাপতে গিয়ে ফিরে এসে মনিকে তুলে নিল কোলে। একটু আদর করে পুনরায় নূরীর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বললো— খোদা হাফেজ!

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসল।

রহমান চেপে বলল তার দুলকির পিঠে।

নূরী নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুরের দিকে। বনহুরের অশ্ব তাজ ও রহমানের অশ্ব দুলকি তখন ছুটতে শুরু করেছে।

হঠাৎ মনি শব্দ করে উঠল— বা ব্বা ব্বা-----

নূরী চমকে উঠল, মৃদু চাপাকণ্ঠে বলল— কই, তোমার বাব্বা মনি? চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল মনির গাল দুটো।

বনহুর আর রহমানের অশ্ব তখন অদৃশ্য হয়েছে।

গহন বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে দস্যু বনহুর আর রহমান। বলিষ্ঠ দুই ভীল সর্দার যেন শিকারের অন্বেষণে চলেছে, তেজোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল— বিশাল বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু দেখলেই মনে হয় শক্তিশালী বীর পুরুষ এরা।

❑

ঝিন্দে পৌছে বনহুর আর রহমান ভীল সর্দারের বেশেই ঝিন্দ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। ঝিন্দ রাজার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ বনহুর আর রহমান দুটো হরিণ শিকার করে নিয়ে গিয়েছিল, তাই দিল।

ঝিন্দ রাজা হরিণ পেয়ে অনেক খুশি হলেন। বনহুর আর রহমানকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। এই বিদেশী ভীল সর্দারদ্বয়ের যেন কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য জয়সিন্ধ তার লোকদের আদেশ দিলেন।

রাজ-অন্তপুরের একটি কক্ষে বনহুর আর রহমানের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো, কিন্তু বনহুর এতে রাজী হলো না, আপত্তি জানিয়ে বলল— মহারাজ, আমরা ভীল জাতি, আমাদের থাকার জন্য ঘরদোর দরকার হবে না, শুধু আপনার রাজ্যে থাকার অনুমতি চাই।

বৃদ্ধ মহারাজ কিছুতেই সম্মতি দান করলেন না, তিনি বললেন—হাজার হলেও আপনারা আমার অতিথি, কাজেই আপনাদের থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আমারই করা দরকার। বেশ, আমার বাগানবাড়ির একটি কক্ষে আপনাদের থাকার সুব্যবস্থা করা হবে।

শেষ পর্যন্ত বনহুর আর রহমান মহারাজ জয়সিন্ধের কথায় রাজী হয়ে গেল।

ফলে ফুলে ভরা সুসজ্জিত বৃহৎ বাগানবাড়ি।

মহারাজ জয়সিন্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় বাগানবাড়িতে না এলেও তার পুত্র মঙ্গলসিন্ধ বাগানবাড়ি সরগরম করে রেখেছিল। কাজেই বাগানবাড়ির জৌলুস পূর্বের চেয়ে এখন আরও জাকালো রয়েছে।

বাগানবাড়ির একটি নিভৃত অংশে বনহুর আর রহমানের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বাগানবাড়ির অদূরে একটা ছোট অশ্বশালা ছিল, সেখানে তাদের অশ্ব দুটি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

রাজা স্বয়ং এই ভীল অতিথিদ্বয়কে আশ্রয় দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা তাঁর পুত্র মঙ্গল সিন্ধের কানে গেল। মঙ্গল সিন্ধ তখন বাগানবাড়ির একটি বড় কক্ষে দলবল নিয়ে বাঈজী নাচে মশগুল।

কথাটা কানে যেতেই দু'চোখ তার ধক করে জ্বলে উঠল। এ বাগানবাড়ির একমাত্র অধিকারী এখন সে। তখনই সে দু'জন সঙ্গীকে আদেশ দিল, যাও—সেই ভীল সর্দারদ্বয়কে ডেকে আন আমার কাছে।

বনহুর আর রহমান সবেমাত্র বিশ্রামের আয়োজন করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন লোক এসে জানাল— তোমাদের দু'জনকে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ ডেকেছেন।

রহমান তাকালো বনহুরের দিকে—

বনহুর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল— গিয়ে বল আমরা ক্লান্ত এখন যেতে পারব না।

লোক দু'জন ফিরে গিয়ে কথাটা জানালো মঙ্গলসিন্ধকে।

রাগে গর্জে উঠল কুমার মঙ্গলসিন্ধ— কি বললে, এত সাহস সামান্য ভীল সর্দারের যে, আমার আদেশ অমান্য করে! যাও পুনরায় গিয়ে বল এখনি আমি তাদের চাই।

আবার লোক দুটি ছুটলো।

বনহুর এবার লোক দুটিকে দেখে সোজা হয়ে বসল, বলল— কি খবর বান্দা?

লোক দুটির একজন বলে উঠল— এখনই যেতে হবে। না গেলে চলবে না।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল— তাকেই আসতে বল, যদি তার বিলম্ব সহ্য না হয়।

এবারও ফিরে গেল ওরা।

ভীল সর্দারদ্বয়ের কথা শুনে রেগে আগুন হলো কুমার মঙ্গলসিন্ধ, ক্রুদ্ধ ভাবে উঠে দাঁড়াল চল দেখে নেব কোন রাজা মহারাজা তারা।

কুমার মঙ্গলসিন্ধ হাজির হলো বাগানবাড়ির সেই কক্ষে, যে কক্ষে দস্যু বনহুর আর রহমানকে থাকতে দেয়া হয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ ও তার সঙ্গীদ্বয় কক্ষে প্রবেশ করতেই রহমান উঠে দাঁড়াল বনহুর যেমন শুয়েছিল তেমনি রইলো। কোন অভিবাদন বা সম্ভাষণ জানালো না।

মঙ্গলসিন্ধের চোখে-মুখে তখন মদের নেশা, বনহুরের তাচ্ছিল্য ভাব লক্ষ্য করে হুঙ্কার ছাড়ল আমি ডেকেছিলাম কেন যাওনি?

বনহুর হেসে বলল—বিনা কারণে ডাকলে আমি যাই না।

কি বললে ভীল সর্দার, আমি তোমাকে বিনা কারণে ডেকেছি!

তা নয় তো কি?

আমি জানতে চাই কার হুকুমে তোমরা আমার বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছ?

বনহুর মৃদু হেসে বলল— তোমার পিতার কাছে এ প্রশ্ন করলে জবাব পাবে।

এ বাগানবাড়ি আমার।

না, তোমার পিতার। তাঁর আদেশেই আমরা বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি।

তিনি বৃদ্ধ, এখন তাঁর মতিভ্রম ঘটেছে। নইলে সামান্য ভীল সর্দার তার বাগানবাড়িতে স্থান লাভ করে! শোন ভীল সর্দার, যদি তোমরা মঙ্গল চাও, তবে এক্ষুনি আমার বাগানবাড়ি ত্যাগ কর।

নইলে কি করবে রাজকুমার? বলল বনহুর।

তোমাদের আমি শাস্তি দেব, কঠিন শাস্তি।

অতি উত্তম। এখন বিশ্রাম করতে দাও। যাও, তোমরা। বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

তখনকার মত কুমার মঙ্গলসিন্ধ বিদায় নিতে বাধ্য হল।

চলে যাবার সময় কটমট করে বনহুর আর রহমানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে যেতেই রহমান বলল—সর্দার, এটা কি ভাল হলো?

তা পরে দেখা যাবে। এখন বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন, বিশ্রাম কর। বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল বনহুর।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে রহমান খেয়াল নেই তার।

হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠের করুণ তীব্র আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল রহমানের। আজ কয়েক দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিল, তাই এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ঘুম ভাঙতেই বিছানায় সজাগ হয়ে উঠে বসল। কক্ষের একপাশে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল তারই আলোতে রহমান দেখলো বিছানায় বনহুর নেই।

রহমানের মনের ভেতর চড়াৎ করে উঠল, তাকে না জানিয়ে এভাবে কোথায় গেছে সর্দার! বিছানা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল দরজা খোলা। ব্যাপার কি, এ অন্ধকার রাতে হঠাৎ সর্দার গেল কোথায়! যদিও বনহুর দস্যু তবু রহমান একটু আশঙ্কিত হলো। নতুন স্থান, নতুন পরিবেশ, রাত দুপুরে তাকে না জানিয়ে কোথায় গেল সর্দার? তারপর নারীকণ্ঠের তীব্র করুণ আর্তনাদ।

রহমান কান পেতে রইলো, না আর কোন শব্দই সে শুনতে পেল না।

ধীরে ধীরে দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

যদিও রহমান এবং বনহুরের শরীরে ভীল সর্দারের ড্রেস ছিল, কিন্তু নিচে ছোট্ট প্যান্ট পরা ছিল, তাতে লুকানো ছিল ছোরা আর পিস্তল। আর ছিল গুলি। প্রকাশ্যে তাদের পিঠে বাঁধা থাকত তীরধনু।

রহমান প্যান্টের পকেট থেকে ক্ষুদ্র রিভালবারখানা নিয়ে অন্ধকারে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগুলো।

বাগানবাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো রহমান, বড় ঘরটার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই শিউরে উঠল।

কুমার মঙ্গলসিন্ধের সামনে মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি যুবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ।

রহমান তার উদ্যত রিভলবার হাতে খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে কে যেন তার কাঁধে হাত রাখল।

অন্ধকারে চমকে ফিরে তাকালো রহমান, অস্ফুট চাপাকণ্ঠে বলল— সর্দার। খুন!

বনহুর ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বলল— চুপ্!